।। মহাকাব্য-জিজ্ঞাসা ।।

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

মহাকাব্য-জিজ্ঞাসা

অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য, এম্. এ. ডি. ফিল.
বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক
পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য-নাট্য সংগীত একাডেমির নাট্যবিভাগের
এবং
'আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনের' প্রধান অধ্যাপক

নবারুণ প্রকাশনী
সি ৫১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
সুবোধ রায়
নবারুণ প্রকাশনী
সি ৫১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬১

॥ তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥

মুদ্রক :
কার্ত্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

বড়দি—৺হেমলতা

ও

ছোড়দি—৺যোগমায়া'র

স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

লেখকের নিবেদন

বি-এ এবং এম. এ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় মহাকাব্যের স্থান বহুকাল ধরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। নবপ্রবর্তিত ব্যবস্থায় বিশেষতঃ ডিগ্রী কোর্সে মহাকাব্যের জন্য আরো বেশী স্থান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু, দুঃখেরই কথা কয়েকটি প্রবন্ধ এবং ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাড়া মহাকাব্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় আর কিছুই পাওয়া যায় না—আজও বাংলাভাষায় মহাকাব্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ কোন আলোচনা-গ্রন্থ রচিত হয়নি। আমাদের শিক্ষার্থীরা এ সম্বন্ধে যেটুকু শোনে তা' ঐ অধ্যাপকগণের প্রারম্ভিক ভাষণ থেকেই আর যেটুকু পড়ে তা সম্পাদিত পাঠ্য গ্রন্থখানির সংক্ষিপ্ত ভূমিকা থেকেই। বলা বাহুল্য তা প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কাছে পর্যাপ্ত নয়। মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপের স্পষ্ট ধারণা না থাকায় এবং বিভিন্ন ভাষার মহাকাব্যের সঙ্গে, অতিসাধারণ পরিচয় বলতে যা বুঝায় সেটুকুও না থাকায়, শিক্ষার্থীরা নিজের উপলব্ধির উপরে দাঁড়িয়ে মহাকাব্যের প্রকৃতি এবং মহত্ত্বের মাত্রা বিচার করার শক্তি সঞ্চয় করে না। অবশ্য, ইংরেজীতে এবং অন্যান্য ভাষায় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আছে কিন্তু সকলের পক্ষে তা পড়া এবং শাসন করা সম্ভব নয়, আর সম্ভব হলেও সব মতকে একত্রে পাওয়া বা সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

অধ্যাপনা করতে গিয়ে এই অভাবটি আমি বিশেষভাবেই অনুভব করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অভাব মেটাবার একটা তাগিদও বোধ করেছি। এই গ্রন্থখানি সেই তাগিদেরই ফল।

এই গ্রন্থে আমি, প্রথমতঃ মহত্ত্ব ও মহীয়ানত্ব (সাবলাইম) সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। মহত্ত্ব বোধের উৎপত্তি ও স্বরূপ নিয়ে প্রতীচ্য সাহিত্যদর্শনে যতরকম আলোচনা আছে তার বিবরণ দিয়েছি তথা মহত্ত্বের ও মহীয়ানত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে যত রকম আলোচনা করা হয়েছে তাদের ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছি এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দোষগুণের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি। তৃতীয়তঃ—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন যুগে

যে-সব মহাকাব্য রচিত হয়েছে তাদের বিষয়বস্তু এবং গঠন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়টি যোজনা করেছি—পাঠকের মহাকাব্য-জিজ্ঞাসাকে সর্বতোভাবে পূরণ করার উদ্দেশ্যেই। কোথায় কবে এবং কে কোন্ মহাকাব্য রচনা করেছেন এই স্বাভাবিক জিজ্ঞাসাকে যেমন এই অধ্যায়ে পূরণ করার চেষ্টা করেছি তেমনি মহাকাব্যগুলির আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে মহাকাব্যের ধারণাকে স্পষ্টতর করতে চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়েরই অন্তর্গত বাংলা মহাকাব্য পরিচ্ছেদটি আরো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য যোজনা করেছি।

বাংলার মহাকবি ও মহাকাব্য সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা প্রচলিত আছে, আমি তাদের সঙ্গে সব বিষয়ে সুর মেলাতে পারিনি। কবি ও কাব্যকে আমি নতুন আলোকে রেখে দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা তা বিচার করবেন। আলোচনা পূর্ণাঙ্গ বা ত্রুটিহীন হয়েছে—এ দাবী করবার মতো পাণ্ডিত্য আমার নেই। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য—জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসাকে উত্তেজিত করতে সাহায্য করা এবং বাংলা ভাষায় মহাকাব্যতত্ত্ব আলোচনার ভিত্তি স্থাপনা করা। আশা করি সহৃদয় পাঠক নিজগুণে সব দোষ ত্রুটি মার্জনা করবেন এবং আমার উদ্দেশ্য কতখানি সফল হয়েছে তা বিচার করবেন। পাঠকদের আগ্রহের অভাব না ঘটলে—এই ক্ষুদ্রকায় 'মহাকাব্য জিজ্ঞাসা' অনতিবিলম্বেই পূর্ণাবয়ব—'মহাকাব্য জিজ্ঞাসা'য় রূপান্তরিত হবে—এ আশা আমি পোষণ করি।

এই গ্রন্থরচনায় অনেকেই অনেকভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি—শ্রীমান সুবোধ রায়কে, যিনি গ্রন্থখানি প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নিবেদন—ইতি

'ক্ষীরোদা-স্মরণ' : সুভাষনগর
দমদম গোরাবাজার : কলিকাতা—২৮

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

বিষয়সূচী

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

১-৫। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (৫ খণ্ড)
৬। নাটক ও নাটকীয়ত্ব
৭। নাটক লেখার মূল সূত্র
৮। রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা
৯। এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্যতত্ত্ব
১০। হোরেসের "আর্স পোয়েটিকা"
১১। শিল্পতত্ত্বের কথা
১২। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা
১৩। নাটকের রূপ-রীতি-প্রয়োগ
১৪। ক্রোচের এস্থেটিক

(১২-১৪ যন্ত্রস্থ)

মহাকাব্য-জিজ্ঞাসা

॥ ১ ॥

মহত্ত্ব ও মহীয়ানত্ব

(*প্রাকৃতিক, জৈবিক, মনোজৈবিক এবং শৈল্পিক*)

কোন্ ধর্ম ব্যক্ত হলে, প্রাকৃতিক বস্তুকে ও ঘটনাকে, প্রাণীর আকৃতিকে ও আচরণকে, সামাজিক জীবনকে, ঘটনাকে এবং শিল্পিত বস্তুকে বা রচনাকে 'মহান' শব্দটি দ্বারা আমরা বিশেষিত করে থাকি, তা' সম্যগ্‌ভাবে জানতে গেলেই প্রথমেই জানতে হবে **মহত্ত্বের সংজ্ঞা ও স্বরূপকে**। মহত্ত্বের 'কি এবং কোথায়' কি রূপে প্রকাশ পায় তা' না জানলে, শুধু যে লৌকিক জগতের মহত্ত্বকেই বুঝতে পারা যাবে না, তা নয়, অলৌকিক অর্থাৎ শৈল্পিক জগতের মহত্ত্বকেও সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। অতএব সকলের আগে মহত্ত্বের লক্ষণটি নিরূপণ করার চেষ্টা করা দরকার।

মহত্ত্বের লক্ষণ নিরূপণ করা, বলা বাহুল্য, আসলে মহত্ত্ব বোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা অর্থাৎ মহত্ত্ববোধের **উৎপত্তি এবং প্রকৃতি নিয়ে** আলোচনা করা। আরো বাহুল্য এই কথাটি বলা যে মহত্ত্ব বিশেষ রকমের একটা **ধারণা বা বোধ** (Idea) এবং বোধ শক্তির অভাবে কোনরূপ ধারণাই জন্ম নিতে পারে না। যেখানে কোন বোধশক্তিসম্পন্ন জীব নেই, সেখানে কোন ধারণার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। আর এ পর্যন্ত বুঝতে কারো কোন বেগ পেতেও হয় না।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় সেখান থেকেই যেখানে প্রশ্ন ওঠে—ধারণামাত্রই বিষয় সাপেক্ষ কি না অর্থাৎ বস্তু-অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই বিশুদ্ধ চৈতন্য ধারণার জন্ম দিতে পারে কিনা, ধারণার জন্য একমাত্র চৈতন্যশক্তিই কি যথেষ্ট না বিষয়ের জগৎও চাই? বিষয় এবং বিষয়ীর সন্নিকর্ষ কি ধারণার জন্য অপরিহার্য? এই প্রশ্নের উত্তর অপরিহার্য বটে কিন্তু এই নিয়েই যত সমস্যা—যত বেগ। এককোটিক উত্তর দিতে যাঁরা গেছেন তাঁরাই সমস্যা আরো ঘোরালো করেছেন। একদল—বস্তু জগৎ এবং ধারণার জগৎ—সব কিছুকেই একমাত্র

চৈতন্যেরই সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেছেন ধারণাকে বিষয়-নিরপেক্ষ কেবল চৈতন্যক্রিয়ায় পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন। এই দলের মতে সায় দিলে—এই কথাই স্বীকার করতে হবে যে ধারণার জন্য চেতনাকে বিষয়ের ধার ধারতে হয় না, নিজের থেকেই চেতনা যা-খুসী ধারণা গড়ে থাকে এবং যে কোন অবস্থায় যে-কোন ধারণা তার হতে পারে। এক কথায় স্বীকার করতে হয়—জগৎ ও জীবন না থাকলেও, জগতের ধারণা এবং জীবনের ধারণা থাকতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীকার করতে হয় যে মহত্ত্বের ধারণা মহান বস্তু বা মহান ঘটনা ব্যতিরেকেই সম্ভব—নিছক মনগড়া ব্যাপার—আকাশস্থ নিরালম্ব সামগ্রী। আর একদল বলেন, জ্ঞানে বিষয়েরই একমাত্র প্রাধান্য—জ্ঞান বিষয়াকারা প্রতীতিমাত্র ; যেমন বিষয় তেমনি জ্ঞান। জ্ঞানের ব্যাপারে চৈতন্য নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। এই দলের মতে সায় দিলে, স্বীকার করতে হয়—ধারণা ব্যাপারে বিষয়ই নিয়ন্তা, বিষয়ী শুধুমাত্র গ্রহীতা, বিষয়ে কোন কিছু আরোপ করার শক্তি বিষয়ীতে নেই, তার কাছে যা দেখতে ছোট তাই ছোট, যা' বড় তাই বড়, ছোটর মধ্যে বড়কে বা বড়র মধ্যে ছোটকে দেখার শক্তি তার নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে—মহত্ত্বের ধারণার জন্য একমাত্র বড় আকারের বিষয়ই চাই। আর একদল আছেন যাঁরা বিষয়ের ও বিষয়ী উভয়েরই মর্যাদা স্বীকার করেন—স্বীকার করেন বিষয়ীর বিষয়-সংস্কার পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকেই উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু বিষয়ীর কল্পনাশক্তি আছে—স্বাধীনভাবে সে বস্তুকে সংকুচিত সম্প্রসারিত এবং সংশ্লেষিত করতে পারে। এদের মতে সায় দিলে স্বীকার করতে হয়—প্রত্যেক ধারণার জন্য বিষয়ী ও বিষয়ীর সন্নিকর্ষ এবং বিষয়ীর স্বীকরণ-শক্তি অত্যাবশ্যক। বিষয় বা বিষয়ী একক ভাবে ধারণাকে সৃষ্টি করতে পারে না। বিষয়কে আশ্রয় ক'রে এবং বিষয়ীর সংস্কার-অনুযায়ী চেতনায় ধারণা গড়ে উঠে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই স্বীকৃতির তাৎপর্য এই যে মহত্ত্বের ধারণা—সে মহত্ত্ব প্রাকৃতিক, জৈবিক, মনোজৈবিক, শৈল্পিক যাই হোক না কেন—খামখেয়ালি ব্যাপার নয় ; বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েরই প্রকৃতির উপর তা নির্ভরশীল এবং উভয়ের সহযোগিতার ফলেই তা গড়ে উঠে।

দেখা যাচ্ছে, 'ধারণা'কে বিষয় সাপেক্ষ বা বিষয় নিয়ন্ত্রিত বলা হবে কিনা, মহত্ত্বের ধারণার উৎপত্তি ও স্বরূপ বিচার করতে গেলে, এ প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্যই করে নেওয়া দরকার। কিন্তু তা' করতে যাওয়ার অর্থ—

একেবারে গোড়ায় ফিরে যাওয়া অর্থাৎ কি করে ধারণার জগৎ গড়ে উঠেছে ধারণা ব্যাপারে বিষয়েরও বিষয়ীর পারস্পরিক সম্পর্কের রূপটি কি—বিষয় ও বিষয়ীর আসল সম্পর্ক কি—এই সব জটিল জটিল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা। বলা অতি বাহুল্য, এই সব প্রশ্নের আলোচনা করা দর্শনেরই জটিলতম সমস্যার সম্মুখীন হওয়া—চৈতন্যবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের যে-কোন একটিকে পরাদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা এবং তারই সিদ্ধান্ত অনুসারে মীমাংসায় পৌছতে চেষ্টা করা—এক কথায় দর্শনের এলেকায় প্রবেশ করা। আর সত্যিই তো, দর্শন-বিনা দর্শন—হোক না কেন সে সাহিত্য দর্শন হবে কি করে? কোনদিনই তা' হয় নি, আজও হবে না। বাস্তবিকই, এ পর্যন্ত যারাই সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরাই এ-কথা সে-কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত পরাদর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন এবং বিশেষ কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই সাহিত্য-দর্শন গড়ে তুলেছেন। দর্শন অপরিহার্য—জ্ঞাতসারেই আমরা তাকে গ্রহণ করি আর অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করি। এক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। আগেই বলা হয়েছে—মহত্ত্ব একটা ধারণা-বিশেষ। আর যে নিয়মে 'ধারণা' জন্মে, মহত্ত্বের ধারণাও সেই মূল নিয়মের অধীন। এই মূল নিয়ম নিয়ে যে সমস্যা, আসলে তা' দার্শনিক সমস্যা বিষয়-অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই আত্মায় কোন ধারণা জন্মাতে পারে কিনা, সেই সমস্যা, আর এই সমস্ত সমস্যা আসছে—আত্মা সম্বন্ধে, বিষয় সম্বন্ধে এবং উভয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করেছি সেই ধারণা থেকেই। এখানেই আসছে সেই মূল প্রশ্নটি—চৈতন্য আগে না বস্তু আগে? যে চৈতন্য বিশুদ্ধ অর্থাৎ বিষয় জ্ঞানের সংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত সে চৈতন্যের স্বরূপ কি? বিষয় সম্পৃক্ত না হয়েও চৈতন্যে ধারণা জন্মাতে পারে কি না? বলা বাহুল্য—এই সব প্রশ্নের বেশে পরাদর্শনেরই সমস্যাগুলি আমাদের সামনে উপস্থিত।

এই সব প্রশ্নের আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই বটে, কিন্তু বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ, সাহিত্যতত্ত্বের শেষ প্রশ্নের সমাধানে এর মীমাংসার কাছে এত বার দ্বারস্থ হতে হয়, জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য এরই সিদ্ধান্তের উপর এত বেশী মাত্রায় নির্ভর করে যে,—এ সম্বন্ধে সামান্য ভাবে দু'একটা কথা বলে নেওয়া অনুচিত কাজ হবে না। সাধারণ পাঠকের কাছে এই আলোচনা ধান ভানতে শিবের গীতের মতো শোনালেও যে কোন তত্ত্বরসিক সমালোচক

বুঝতে পারবেন যে এই আলোচনাকে কোন মতেই অপ্রাসঙ্গিক বলা চলে না।

যারা দর্শনের ছাত্র তাঁদের কাছে অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস সুবিদিত। বস্তু থেকে চৈতন্যের আবির্ভাব না চৈতন্য থেকে বস্তুর উৎপত্তি—এই প্রশ্ন নিয়ে দর্শনে বহুকাল আগে থেকেই দ্বন্দ্ব চলে আসছে, এখনও কোন অবিসংবাদিত মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। যাঁরা বিশুদ্ধ চৈতন্যকে বস্তুজগতের প্রাকভাবী ব'লে প্রমাণ করতে চান তাঁরা আখ্যা পেয়েছেন ভাববাদী বা "অধ্যাত্মবাদী" আর যারা বস্তুজগৎকে চেতনার প্রাকভাবী স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে মনে করেন তাদের বলা হয়েছে "বস্তুবাদী"। চেতনা আগে কি বস্তু আগে, কোনটিকে অবলম্বন করে কোনটি নিজের সত্তা বজায় রাখছে—এই নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে দলাদলি চলে আসছে বহুকাল আগে থেকেই। দলাদলির ইতিহাস এখানে অবান্তর হলেও, কি নিয়ে দলাদলি তা একটু জানা দরকার।

গোঁড়া ভাববাদীরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন—এই জগৎ মায়া—আত্মার ধারণা মাত্র ; ধারণার বাইরে তার কোন সত্তা নেই ; এক কথায় ধারণার উপরেই জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। ধারণাই অস্তিত্বের প্রমাণ, অতএব ধারণাই অস্তিত্ব। আধুনিক দর্শনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহামতি রণে দেকার্তের বহুকথিত একটি উক্তিকে ভাববাদীরা খুব কাজে লাগিয়েছেন। দেকার্তে একটি মূল সূত্র করেছিলেন "কোজিটো এরগো সুম"—চিন্তা করছি অতএব আমি আছি। এই উক্তিটিকে মূলধন ক'রে, ভাববাদীরা বস্তুজগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব লোপ করার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই ভাবে তারা যুক্তিব্যূহ রচনা করেছিলেন—যেহেতু চিন্তার বা জানার উপরেই বস্তুর থাকার না-থাকার ধারণা নির্ভর করছে, সেইহেতু জগতের অস্তিত্বের ধারণা তথা জগতের অস্তিত্বও মনে-করার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। জগতের নিজের কোন পারমার্থিক (যে অস্তিত্ব অন্য কোন সত্তার উপর নির্ভরশীল নয়) নেই, জগৎ মনেরই কল্পনামাত্র।

জগতের পারমার্থিক সত্তা বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য ভাববাদী দার্শনিকরা যে চেষ্টা করেছেন তা সফল হয়নি। তাঁদের যুক্তির মূলে যে গলদ আছে তা প্রায় সকলেই বুঝতে পেরেছেন। এঁরা যুক্তির মারপ্যাঁচে দুর্বল-

মস্তিষ্কের চোখে ধাঁধা লাগাতে পারলেও শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ না দিয়ে পারেন নি।

এ পর্যন্ত ভাববাদীদের যুক্তি সকলেই মানতে বাধ্য যে—কোন কিছুর ধারণা, কোন মনের অভাবে সম্ভব নয়। যেখানে ধারণাক্ষম মন নেই সেখানে কোনরূপ ধারণাও নেই। এ পর্যন্ত আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু আপত্তি ওঠে সেখানেই যেখানে অস্তিত্বকে এবং অস্তিত্বের ধারণাকে অভিন্ন মনে করা হয়। এখানেই যুক্তির বড় ফাঁকি। কোন 'বস্তুর ধারণা' এবং 'বস্তুর অস্তিত্ব' বস্তুতঃ এক নয়। 'বস্তুর ধারণা' কোন মননক্ষম চিৎশক্তির মনন ব্যাপারের অধীন বটে, কিন্তু বস্তুর 'অস্তিত্ব' কোন মনের মনে-করার উপর নির্ভর করে না।

এখানে কূট প্রশ্ন উঠতে পারে অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বও তো ধারণা; কোন মন যাকে অস্তি ব'লে স্বীকৃতি জানায়নি, তার অস্তিত্ব-নাস্তিত্বের নিয়ে কথা উঠবে কেন? ধারণার বাইরে যে অস্তিত্ব তার প্রমাণ কোথায়? ধারণার বাইরে যে অস্তিত্ব সে কি নাস্তিত্বেরই সামিল নয়? এ কথা অস্বীকার করা যায় না বটে যে—'আছে' বা 'নেই' মনেরই ধারণা এবং সেই হিসাবে ধারণাসাপেক্ষ এবং এমন কি বস্তুজগৎ বলে ধারণা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে—এটাও ধারণা বিশেষ, অতএব ধারণারই উপর স্বতন্ত্র বস্তুজগতের অস্তিত্বের প্রমাণ নির্ভর করে; কিন্তু তাই বলে এ কথাও স্বীকার করতে আমরা বাধ্য নই যে "বস্তুর ধারণা" এবং—বস্তু অভিন্ন, ধারণাই বস্তুর উপাদান বা নিমিত্ত কারণ।

ধারণা বা চেতনাকে এবং বস্তুকে সমধর্মী বলে স্বীকার না করা পর্যন্ত ঐ সমীকরণ সম্ভব নয়। তা সম্ভব না হলে এই কথাই স্বীকার করতে হবে যে চৈতন্যস্বরূপ নয় এমন একটা অচেতন সত্তা পরমার্থতঃ আছে। এই সত্তাই বিষয়ী আত্মার জ্ঞানের বিষয়। এর বৈচিত্র্য আশ্রয় করেই আত্মার মধ্যে বিভিন্ন ধারণার উৎপত্তি হয়ে থাকে।

তারপর, সৎ-ধর্ম বা বস্তুধর্ম এবং চিদধর্ম যে দুটি বিজাতীয় বস্তু—শাস্ত্র থেকেও তার প্রমাণ সংগ্রহ করা যেতে পারে। সৎ এবং চিৎ পৃথক ধর্ম না হলে পৃথক নির্বচনের কোন সার্থকতাই থাকতো না। পৃথক নির্বচন যখন শাস্ত্রে করা হয়েছে তখন বুঝতে হবে—'সৎ' এবং চিৎ দুটি স্বতন্ত্র ধর্ম। তাই যদি হয়, তাহলে একটু তলিয়েই দেখা যাক—বিশুদ্ধ চৈতন্য বলতে আমরা কি ধারণা পোষণ করে থাকি। চিৎ-শক্তি তন্মাত্ররূপে জ্ঞানশক্তি বিশেষ। বিশুদ্ধ

চিৎ বলতে বুঝায় সেই চৈতন্য যাতে কোনরূপ বিষয়ের প্রতীতি জন্মেনি বা বস্তুর ছাপ এখনও পড়েনি—যে চৈতন্য নিরাশ্রয় অর্থাৎ নিজেকে ছাড়া অন্য কোন বিষেয়কে জানবার অবকাশ যার ঘটেনি। এই চৈতন্য নিরাশ্রয় অসঙ্গ নির্বিষয় সুতরাং নিরঞ্জন। বলা বাহুল্য এই জাতীয় চৈতন্য যত বিশুদ্ধই হোক বিষয়-প্রতীতির বা জ্ঞানের দিক দিয়ে একেবারেই শূন্য—অস্পৃষ্ট। এক কথায় বলা যেতে পারে—এই জাতীয় বিশুদ্ধ চৈতন্য অসৎকল্প পদার্থ কারণ, চৈতন্যকে যদি আমরা বলি জ্ঞানস্বভাব, এবং যদি স্বীকার করি, যে জ্ঞান কোন বিষয়েরই জ্ঞান নয় সে জ্ঞান বস্তুতঃ অসৎ, তাহলে বলতে পারি যে চৈতন্য বিষয়সম্পৃক্ত বা বিষয়াশ্রয়ী নয়, সে চৈতন্য থেকেও নেই। এ কথা যদি মানতে হয় যে 'বিষয়াকারা প্রতীতি' চেতনায় মুদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত, বিচিত্র জ্ঞানে চেতনা সমৃদ্ধ তথা ব্যক্ত হতে পারে না, তা হলে এই কথাই স্বীকার করা হয় যে চিৎশক্তির ক্রিয়ার বা অস্তিত্বের জন্য চিদ্‌নিরপেক্ষ সৎস্বরূপ কোন পদার্থ আবশ্যক।

আর একদিক থেকেও বস্তুর ধারণা ও বস্তুর স্বরূপ যে এক নয়—'তা' প্রমাণ করা চলে। ধারণার উপরেই যদি বস্তুর বাস্তব সত্তা বা স্বরূপ নির্ভর করত, তা' হ'লে বস্তু সম্বন্ধে কখনই কোন ভুল ধারণা হতে পারত না—সত্য-মিথ্যার ভেদজ্ঞান সম্ভব হত না। বস্তুর ধারণামাত্রই যে বস্তু-স্বরূপ নয় তার প্রমাণ এই যে একই বস্তুস্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা হওয়া সম্ভব। একের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়, অন্যের ধারণা সত্য বলে সমাদৃত হয়। শুধু মনে করার উপরেই বস্তুর-স্বরূপ বা অস্তিত্ব নির্ভর করলে এমনটি হতে পারত না। একটি বৈদিক উক্তিকে সমর্থক প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ঋষি যখন বলেছিলেন—একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি · তখন নিশ্চয়ই এই মনে করেই বলেছিলেন যে ঋষিদের বলাবলিতে অর্থাৎ মনে-করাকরিতে, এককথায় ধারণায় 'সৎ'-এর অস্তিত্বের বা স্বরূপের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না—কোন ঋষির মনে করার উপরে 'সৎ'-এর অস্তিত্ব নির্ভর করে না—'সৎ' ঋষিদের ধারণা-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তাবান পদার্থ। ঋষিদের আগেও তিনি ছিলেন, ঋষিরা যখন থাকবেন না তখনও তিনি থাকবেন। এই 'সৎ' 'স্বমহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত—ঋষিদের মনের ধারণা দিয়ে তিনি গঠিত নন। সব ধারণার আগে 'সৎ' বর্তমান।

অতএব, মনেকরা-নিরপেক্ষ সৎ-স্বরূপ পদার্থ স্বীকার না করলে নিত্যসত্যের ভিত্তি যেমন ধ্বসে যায়, তেমনি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় ঈশ্বর প্রভৃতি নিত্য সত্তা

কল্পনা করার অবকাশ। ব্যক্তিগত ধারণার বাইরে, কি সত্যের, কি ঈশ্বরের কারোই দাঁড়াবার স্থান থাকে না।

আর একটি প্রমাণ দিয়েও দেখানো যেতে পারে যে ধারণার উপাদান দিয়ে জগৎ গড়া হয়নি বা ধারণার অভাবে জগতের অভাব ঘটে না। তর্কের খাতিরে না হয় ধরেই নেওয়া গেল যে জগতের স্বরূপ তথা অস্তিত্ব মনে করার উপর নির্ভর ক'রে এবং মানুষের মনে করার শক্তি আছে বলেই মানুষ তার চারদিকে একটা জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছে। কিন্তু যে জীবের ধারণা করার শক্তি নেই, সে কোন্ জগতে বাস করে? মনে করার উপরে জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করলে, এই কথাই বলতে হয় যে—যেহেতু পশুদের জগৎ-সম্বন্ধীয় কোন ধারণা নেই, পশুর স্তরে জগৎ বলেই কোন কিছু নেই। প্রশ্ন হবেই, পশুরা তবে থাকে কোথায়? দেশ-কালে নেই অথচ আছে সে কোন্ থাকা? তারপর কল্পনায় আরো একটু পিছিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। আমরা অবশ্যই পৃথিবীর এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারি, যখন পৃথিবীর বুকে কোন প্রাণীর জন্ম হয়নি। জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড অর্থাৎ সূর্য থেকে সদ্য সদ্য বেরিয়ে এসেছিল যে পৃথিবী তার বুকেও, প্রাণীর কল্পনা করতে পারে এমন কোন গ্যাসময় মস্তিষ্ক আছে? সূর্যের মতো আরো কত অসংখ্য সূর্য আকাশে ঘুরপাক খাচ্ছে—এবং তারা কা'রো মনে-করার ধার না ধেরেই আছে।

অতএব আমরা অবশ্যই এ ধারণা করতে পারি যে—মনে-করার অপেক্ষা না রেখেই বস্তুজগৎ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বিরাজ করতে পারে—বস্তুজগতের থাকা বা না থাকা মনে-করার অর্থাৎ ধারণার উপর নির্ভর করে না। 'চিৎ'-এর আগেও 'সৎ' থাকতে পারে।

'চিৎ' আগে কি 'সৎ' আগে 'চিৎ' থেকে 'সৎ' এসেছে বা 'সৎ' থেকে 'চিৎ' এসেছে—পরাদর্শনের অতি জটিল এবং মূল প্রশ্ন। এখানে এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, এখানে শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে যে চিৎ বিপরিণত হয়ে 'সৎ'-এ রূপান্তরিত হোক আর সৎ বিপরিণত ও সংশ্লিষ্ট হয়ে 'চিৎ'-ধর্মী হয়ে উঠুক 'চিৎ' অপেক্ষা 'সৎ'কেই প্রাক্‌ভাবী বলে স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। কারণ 'চিৎ'-এর অস্তিত্ব নেই অথচ সৎ আছে এ অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু 'সৎ' অর্থাৎ অচিৎ-স্বভাব কোন সত্তা নেই অথচ 'চিৎ' আছে—এ অবস্থা কল্পনা করা যায় না। স্থিতি-গতি-

লয় কল্পনা করতে গেলেই—দেশ-কাল-অধিকরণ কল্পনা করতে হয়। চিৎ-সত্তার স্থিতির জন্যও অধিকরণ অপরিহার্য। অধিকরণ বা আধার নিশ্চয়ই আধেয় অপেক্ষা প্রাক্‌ভাবী। বাস্তবিক, দেশ-কালকে চিৎ-স্বভাব বলে স্বীকার না করলে এবং প্রত্যেক অস্তিত্বের জন্য দেশ-কালের অধিকরণ অপেক্ষিত এ কথা স্বীকার করলে—এই কথাই, শেষ পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে চিৎ-সত্তার প্রাক্‌ভাবী অচিৎ-স্বভাব এক স্বতন্ত্র সত্তা বা প্রকৃতি আছে। এই প্রকৃতির সঙ্গে সন্নিকর্ষের ফলেই চিদ্‌, আত্মবিকাশের সুযোগ পায়—তা'তে, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য অনুসারে, বিচিত্র ধারণা জন্ম লাভ করে। এ আলোচনা এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

কেন এই নীরস দার্শনিক আলোচনা এতদূর টেনে আনা হল তার কৈফিয়ৎ আগেই দিয়েছি। এখানেও একটু দিতে চাই। একদিকে রয়েছে অদ্বৈত চৈতন্যবাদ যা বস্তুজগতকে মায়া বলে, মনের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চায় আর একদিকে রয়েছে– যান্ত্রিক বস্তুবাদ যা বিষয়কেই একমাত্র নিয়ামক মনে করে চৈতন্যকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ; এই দুই অতিকোটিক মতবাদের মধ্যবর্তী যে মতবাদটি বিষয় এবং বিষয়ী উভয়কেই যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে থাকে সেই মতবাদটিকেই আমি আমার আলোচনার দার্শনিক ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে চাই। কেন চাই তা বলার জন্যই এত কথা বলতে হয়েছে। এই সিদ্ধান্তকেই সামনে রেখে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হ'তে চাই যে কোন ধারণাই বিষয়-নিরপেক্ষ বিষয়ী-নিরপেক্ষ হতে পারে না ; জ্ঞান বা ধারণার জন্য বিশিষ্ট বিষয়ও যেমন অপেক্ষিত তেমনি অপেক্ষিত বিশিষ্ট বিষয়ী। আমরা ধারণার বা বোধের মূল সূত্র করছি এই যে, বিষয় তার বিশেষ আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে বিষয়ীর চেতনায় প্রতিগৃহীত হয়ে 'প্রতীতি'তে পরিণত হয় এবং বিষয়ীর সংস্কার বা ভাববন্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানারূপ বোধ উদ্বোধিত করে। এই কথাটি আমাদের বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে—ধারণা মানুষের মনেই জাগে বটে কিন্তু জাগে বিষয়কে আশ্রয় করেই এবং সেই হিসাবে প্রত্যেক ধারণাই বিষয়োপলব্ধি-জনিত মনের বিশেষ একটি অবস্থা। সুতরাং, ধারণার বা বোধের উদ্বোধন ব্যাপারে বিষয়ের অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই আমি এত অপ্রীতিকর দার্শনিক আলোচনার অবতারণা

করেছি। বিষয়নিরপেক্ষ ভাবে ধারণা বা বোধের সৃষ্টি হয় না, বিষয়ের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে বলেই ধারণা বিচিত্র ও বিশিষ্ট হয়ে থাকে এমনি এক কথায় সিদ্ধান্ত করা যেত বটে, কিন্তু মনের সন্দেহ ঘুচত কিনা সন্দেহ। বস্তু-জগতের সঙ্গে আমাদের ধারণার ও বোধের জগৎ কিভাবে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে—ধারণামাত্রই কিভাবে বিষয়সাপেক্ষ—এসব প্রশ্ন বারবার মনে জাগত। চৈতন্যবাদী দর্শনের সংস্কার আমাদের মধ্যে এখনও কত প্রবলভাবে কাজ ক'রে চলেছে ; বড় বড় বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিকে সে কিভাবে ঘুলিয়ে দিচ্ছে—একটুএদিক-ওদিক চাইলেই তা বুঝতে পারা যাবে। এই সংস্কারকে একটু নাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেও আমি সমস্যাটিকে সামান্যভাবে একটু আলোচনা করেছি।

আগেই আমরা বলেছি—বিষয়ভেদে ধারণাভেদ সুতরাং ধারণাভেদের মূলে রয়েছে—বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন রূপে আত্ম-বিভাজন। বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে—আমাদের সামনে যে জগৎ সৎ-রূপে বিরাজ করছে, তাকে আমরা সংক্ষেপে, দেশ-কালের অধিকরণে বিবর্তনশীলা বিচিত্র-রূপসম্ভাবনাময়ী এক মহাশক্তি বলে বর্ণনা করতে পারি। এই মহাশক্তিরই ব্যাপ্তির নাম দেশ এবং বিপরিণামের গতির নাম কাল। দেশ-কাল এবং মহাশক্তি ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট এবং তারই অপর নাম বিশ্ব। এ এক বিরাট শক্তি-ক্ষেত্র—বহু খণ্ড খণ্ড শক্তিক্ষেত্রের সমবায়ে গঠিত এক অখণ্ড শক্তিক্ষেত্র—রূপ-রূপান্তর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের এক মহাতন্ত্র।

এই মহাশক্তি স্বভাবে অস্থির অর্থাৎ গতিময়ী—তাই এর মধ্যে গতি-পরিণতির, সংশ্লেষ-বিশ্লেষের, এক কথায় অনন্ত অভিব্যক্তির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। শক্তির সংশ্লেষ-বিশ্লেষে সেখানে কত ব্যক্তিভেদ। একদিকে বিশ্লেষণের ফলে—"অণোরণীয়ান" অন্যদিকে সংশ্লেষণের ফলে—"মহতোমহীয়ান্"। দার্শনিকপ্রবর বৈজ্ঞানিক বারট্রাণ্ড্ রাসেল মহাশয়ের ভাষায় বললে বলা যেতে পারে—"There is a manifold called the manifold of events which has a system of relations among its terms by means of which it acquires a certain four-dimensional geometry. There is an extra-geometrical quantity called "energy" which is unevenly distributed throughout the

manifold but of which some finite amount exists in every finite volume." 'Energy'-র এই uneven distribution—অর্থাৎ অসম বণ্টনই সমস্ত ব্যক্তিভেদের তথা বস্তুবৈচিত্র্যের মূল কারণ। কোন ব্যক্তি-আয়তনে শক্তি অল্প পরিমাণে রয়েছে এবং কোন ব্যক্তি-আয়তনে শক্তি অধিক পরিমাণে রয়েছে আর তার ফলেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি-আয়তনে শক্তি অল্পপরিমাণে সংহত সেই ব্যক্তি ছোট, যেখানে বেশী পরিমাণে সংহত সেই ব্যক্তি বড়। একদিকে ব্যক্তির অণুতম প্রকাশের মেরু অন্যদিকে ব্যক্তির মহত্তম প্রকাশের মেরু। কিন্তু শক্তি তো শুধু অজৈবিক বস্তুরূপে ব্যক্ত হয়েই থেমে থাকেনি, অজৈবিকের পরে দেখা দিয়েছে—জৈবিক রূপের পর্যায় তার মধ্যে আবার এসেছে মনোজৈবিক রূপের পর্যায়। সব পর্যায়েই শক্তির অসম বণ্টন ঘটেছে এবং শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দেখা দিয়েছে। সব পর্যায়ে অণুতম এবং মহত্তম এই দুই মেরুর মধ্যে, শক্তির অসংখ্য মাত্রাতারতম্য।

অজৈব জগতের দিকে চেয়ে দেখলেই আমরা দেখতে পাই—ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের কত বিচিত্রই না সমাবেশ। মহাব্যোম নীহারিকা নক্ষত্ররাশি সূর্য গ্রহ উপগ্রহ কী বিরাট এক এক শক্তি-ক্ষেত্র। সৌর জগতের মধ্যে অতি সামান্য একটি গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী, তাঁরই বা কি বিরাট রূপ। তার বুকেও আজন্ম এবং অবিরাম গুণময়ী প্রকৃতির বিবর্তনলীলা চলেছে। সেখানে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের কত ব্যক্তি বৈচিত্র্য। কোথাও পাহাড় পর্বতের দিগন্তব্যাপী অভ্রভেদী শৈলসমারোহ কোথাও সাগর মহাসাগরের অপার-অগাধ বিশাল জলমূর্তি, কোথাও অরণ্যভূমির বন-বন্যা, কোথাও দিগন্তস্পর্শী অনন্তবিস্তার প্রান্তর, কোথাও রুক্ষ শুষ্ক বালু-মহাসাগর অনন্ততৃষ্ণাতুর দুস্তর মরুভূমি, কোথাও আগ্নেয়গিরির বিক্ষুব্ধ অগ্ন্যুদ্গার—এমনি কত না 'মহতোমহীয়ান' রূপ পার্থিব প্রকৃতির বুকে আমরা দেখতে পাই। দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে, গভীরতায়, উচ্চতায়, স্থৈর্যে-চঞ্চলতায়, মন্থরতায়—গতিবেগে গাম্ভীর্যে, বিক্ষোভে, নীরবতায়, শব্দমুখরতায়, আভায়-প্রভায়—কত বিচিত্র বিভূতি নিয়ে এরা বিরাজ করছে। অজৈবিক স্তরে অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতে আমরা শক্তির বিভূতিকে দেখি তার বস্তুরূপে এবং গতিরূপে—তরল-কঠিন বাষ্পীয় রূপের স্থিতিশীল বা গতিশীল রূপে। আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে

—অজৈব প্রকৃতিতে আছে বিশেষ বিশেষ আয়তনের বস্তু এবং তার স্থিতি ও গতি। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে মহতোমহীয়ান'কে পাওয়া যাবে আয়তনের বিশালতায়, এবং গতির তেজস্বিতায়। মানুষের সম্মুখে শুধু যে প্রাকৃতিক জগতই আছে তা তো নয়। অজৈবিক স্তরের পরেই দেখা দিয়েছে—জৈবিক জগৎ। এই প্রকৃতির বুকেই সুদূর অতীতের এক অনৈতিহাসিক ঐতিহাসিকক্ষণে ভৌতিক সংশ্লেষণ আশ্রয় ক'রে এক অপূর্ব পদার্থ উদ্ভূত হয়েছিল। এই অপূর্ব পদার্থেরই নাম প্রাণ বা প্রাণী। অণোরণীয়ান এককোষী এক প্রাণী। ভৌতিক জগতের এ এক নতুন রূপান্তর—নতুন অভিব্যক্তি নতুন ধর্মের—প্রাণধর্মের স্তরে উদ্‌গতি। তখনই বস্তুধর্মের পাশে এসে দাঁড়ালো জীবধর্ম। বস্তুধর্ম থেকে এর বিলক্ষণ পার্থক্য হল কয়েকটি প্রবৃত্তিতে ও শক্তিতে—আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিতে—আত্মপ্রজনন. প্রবৃত্তিতে এবং বেদনানুভবে। সেই এককোষী প্রাণীর মধ্যে দেখা দিল সমীকরণের শক্তি—দেহকোষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অনুকূল বস্তু আত্মসাৎ করার চেষ্টা, এককোষ থেকে অন্যকোষ সৃষ্টির আবেগ, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপখাওয়ানোর চেষ্টার উপায়রূপে স্পর্শকাতরতা বা বেদনাবন্ধ। এই সংশ্লিষ্ট পদার্থের কেন্দ্রটি—যাকে সংক্ষেপে বলা যেতে "জীবাত্মা", এককোষী দেহ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি, সংশ্লেষণ শক্তির তারতম্যে তার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে—এককোষী বহুকোষী এবং বিচিত্রকোষী জীবে পরিণত হয়েছে। সেখানেও আমরা দেখি—অল্পপ্রাণ থেকে মহাপ্রাণের দিকে বিবর্তন, অস্ফুট চেতনা থেকে পরিস্ফুট চেতনার দিকে বিবর্তন ঘটেছে।

জীবজগতে, একদিকে রয়েছে এককোষী প্রাণীর 'অণোরণীয়ান' অকৃতি, অন্যদিকে রয়েছে—বহুকোষী অতিকায় জীবের মহতোমহীয়ান আকৃতি; একদিকে রয়েছে অল্পপ্রাণ প্রাণীর দুর্বল জীবনাবেগের নিস্তেজ প্রকৃতি, অন্যদিকে রয়েছে মহাপ্রাণ প্রাণীর দুর্বার জীবনাবেগের তেজস্বী প্রকৃতি। অর্থাৎ একদিকে রয়েছে আকৃতিগত—অণুত্ব বা মহত্ত্ব, অন্যদিকে আছে—প্রকৃতিগত অর্থাৎ দৈহিক শক্তির ও জৈবিক আবেগের অণুত্ব বা মহত্ত্ব। এখানেও আকৃতিগত মহত্ত্ব—আয়তনে এবং প্রকৃতিগত মহত্ত্ব—তেজস্বিতায়। তবে প্রকৃতি-জগতে তেজের প্রকাশ যেখানে গতিতে, জীবজগতে তেজের প্রকাশ—সেখানে দৈহিক শক্তিতে এবং হৃদয় বৃত্তিতে। প্রত্যেকটি জীব এবং

একই প্রজাতির প্রত্যেকটি প্রাণী দৈহিক শক্তিতে বা ভাবাবেগে সমান নয়। জীবজগতে হৃদয়বৃত্তির ঐকান্তিক অভিব্যক্তি বা মহত্ত্ব দেখা যায়—সন্তানের প্রাণ রক্ষার জন্য মাতাপিতার প্রাণপণ সংগ্রামে, প্রজনন সঙ্গীর সঙ্গলাভের জন্য স্ত্রী-পুরুষের বা উভয়েরই ঐকান্তিক কামনায়—একের মৃত্যুতে অন্যের আমরণ অনশনে, প্রাণ দিয়ে প্রভুর সেবা করায়, প্রভুর বা সঙ্গীর জন্য প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে তিলে তিলে শুকিয়ে মরায় - এক কথায় স্নেহে-প্রেমে-মমতায়।

এই জৈবিক স্তরের পরে অর্থাৎ পশু জগতের ঊর্ধ্বে, আমরা দেখি আর একটা জগতকে—মনোজৈবিক প্রাণী মানুষের জগতকে। জীবেরই এ এক বিবর্তিত রূপ—অপূর্ব রূপ—উন্নততর আঙ্গিক ও মানসিক বিকাশ।

উন্নত ধরনের অঙ্গ বা স্নায়ুসংস্থার অধিকারী হয়ে মানুষ চৈতন্য শক্তির উন্নততর অধিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিষয়বস্তুর গ্রহণে, ধারণে, স্মরণে, কল্পনায়, মননে—তার উন্নত মানসিক শক্তি দেখা দিয়েছে। এই মানসিক শক্তির বলেই – মানুষ 'বিবেকী প্রাণী' (rational animal) মর্যাদালাভ করেছে। ইন্দ্রিয়সম্পন্ন পশুরাও জগতকে ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করে—এবং প্রতীতির আকারে ধারণও করে ; কিন্তু পশুদের শক্তি এই পর্যন্তই। তারা প্রতীতির সঙ্গে প্রতীতি মিশিয়ে নতুন রূপ কল্পনা করতে পারে না, তারা বস্তু জ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা বস্তুতত্ত্ব ভাবনা করতে পারে না। এখানেই—এই কল্পনাশক্তি এবং মনন শক্তিতেই মানুষের মন বিলক্ষণ বিশিষ্টতা লাভ করেছে। বলা বাহুল্য এই দুই শক্তি বলেই মানুষ, মানুষের জগৎ বলতে আজ যে জগৎ বুঝায় সেই জগৎ গড়ে তুলেছে। কল্পনাবলে গড়েছে সে শিল্প-সংস্কৃতি, মনন বলে গড়েছে সে দর্শনবিজ্ঞান অর্থাৎ মনন সংস্কৃতি। আর এইসব কিছুর পেছনে রয়েছে—বাক্-শক্তি অর্থাৎ বাগ্‌ভাষা (articulate speech) সৃষ্টির ক্ষমতা। এই কারণেই বাগভাষা প্রয়োগের সামর্থ্যকেই বৈজ্ঞানিকরা মনুষ্যত্বের প্রধান এবং প্রথম লক্ষণ বলে ঘোষণা করেছেন।

যে শক্তির ভিত্তির উপরে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরাট প্রাসাদ গড়ে উঠেছে তাকে এতখানি মর্যাদা দিয়ে বৈজ্ঞানিকরা নিশ্চয়ই অন্যায় কিছু করেননি। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এই শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। শিম্পাঞ্জীদের বাগযন্ত্র, মুখ গহ্বর প্রভৃতি বাকসহায় অঙ্গগুলি মানুষেরই মতো,

অথচ তারা মানুষের মতো বাগভাষার অধিকারী হতে পারেনি এবং পারেনি নাকি একটিমাত্র কারণেই—ঊর্ধ্বতন মস্তিষ্কের association area-র বিস্তারের অভাবেই। ঐ 'association area' না থাকায় তথা বাগ্‌ভাষার অধিকার না পাওয়ার ফলেই, শিম্পাঞ্জী পশুর স্তরেই পড়ে আছে—মানুষের মতো সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী হতে পারেনি। সুতরাং একথা অবশ্যই বলা যায়, এই শক্তির অধিকার পাওয়ার ফলেই, মানুষ 'মানুষ' হয়েছে—যূথবদ্ধ প্রাণীর' স্তরে পড়ে না থেকে 'সামাজিক প্রাণী'তে পরিণত হয়েছে—জাতি-দ্রব্য-গুণ ক্রিয়া—সব কিছুকেই শব্দ সংকেতে বেঁধে কল্পনা ও মনন দিয়ে সভ্যতা সংস্কৃতির প্রাসাদ রচনা করতে সমর্থ হয়েছে। একদিকে মানুষ বাগশক্তিসম্পন্ন, তথা কল্পনা-ও-মননশক্তিসম্পন্ন, অন্যদিকে মানুষ সমাজবদ্ধ—অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষা-আত্মপ্রজননাদি বৃত্তি চরিতার্থ করে—সব ব্যাপারেই সে আর দশজনের ইচ্ছায় গড়া বিধিনিষেধ মেনে চলে। সামাজিক জীব হয়েই মানুষ **'নৈতিক জীব'** এবং **'আধ্যাত্মিক জীব'** হয়েছে। পশুর মধ্যে যেখানে শুধু একমাত্র জৈবিক সত্তা বর্তমান, মানুষের মধ্যে সেখানে জৈবিকসত্তা ছাড়াও, সামাজিক সত্তা অর্থাৎ নৈতিক সত্তা এবং আধ্যাত্মিক সত্তা, ভাবুক সত্তা, ধ্যানী সত্তা, জ্ঞানী সত্তা প্রভৃতি রয়েছে। মানুষ শুধু জীব নয়—সে সামাজিক জীব অর্থাৎ নৈতিক জীব এবং আধ্যাত্মিক জীব।

মানুষের এই তিনটি ধর্মের মধ্যেই—অর্থাৎ **মনোজৈবিকতা** (কল্পনাশক্তি এবং ভাবনা-শক্তিতে যার অভিব্যক্তি ঘটেছে), **নৈতিকতা** (ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্মবোধ এককথায় নিবৃত্তির প্রেরণা) এবং **আধ্যাত্মিকতা** (জগতের ও জীবনের রহস্য খুঁজতে ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, অতিপ্রাকৃত সত্তা অথবা দুর্জ্ঞেয় কোন মহাশক্তি আবিষ্কার করা এবং তাতে ইচ্ছা আরোপ করে, তদনুবর্তী হয়ে জীবনের পরমপুরুষার্থ সাধনা করা)—এই তিন ধর্মের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব নিহিত রয়েছে। আয়তনের বিশালতায়, দৈহিক শক্তির প্রাচুর্যে, শৌর্যে-বীর্যে, জৈবিক আবেগের ঐকান্তিক প্রকাশে যে মহত্ত্ব তা' নিম্নস্তরের সামগ্রী এবং ঠিক মানব মহিমা নয়। মানুষের আসল মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে তাঁর জ্ঞান প্রেম ও কর্মের বিভূতির মধ্যে। সূত্রানুসারে একথা অস্বীকার করা চলে না বটে যে, যেখানেই শক্তির—সে শারীরিক ও মানসিক, যাই হোক না কেন—অপরিমেয় ও অসাধারণ সমাবেশ ঘটে, সেখানেই আমরা মহান্ অভিব্যক্তির রূপটি

সাক্ষাৎকার করে থাকি। তাই যেখানে কোন মানুষ ন্যায়-অন্যায়ের বিধি-নিষেধের ধার না ধেরে অতুলনীয় প্রতাপের দীপ্তিতে উল্কার মতো চোখ ধেঁধে দিয়ে যায়, সেখানেও প্রাণধর্মের (vital force) বিস্ময়কর স্ফূর্তি দেখে, আমরা মুগ্ধ হয়ে থাকি। শক্তির আকর্ষণে আমরা আত্মহারা হয়ে যাই।

কিন্তু এই প্রতাপ-মহত্ত্ব মহত্ত্ব বটে কিন্তু নিশ্চয়ই, মানুষের আসল মহত্ত্ব নয়। আসল মহত্ত্ব অবশ্যই মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব—জ্ঞান-প্রেম-কর্মের মহত্ত্ব—মনোজৈবিকতার—নৈতিকতার এবং আধ্যাত্মিকতার মহত্ত্ব। জ্ঞানের সাধনায় মানুষ যেখানে ঐকান্তিক ও সর্বত্যাগী, 'মন্ত্রেরসাধন কিংবা শরীরপাতন' করতে সঙ্কল্পিত, ধ্যান-সমাহিত থেকে থেকে বাল্মীকস্তূপে পরিণত, আকাশের কিনারা খুঁজতে গিয়ে নিখোঁজ, গ্রহ-নক্ষত্রের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে ভস্মমুষ্টিতে পর্যবসিত, অপার-অতল মহাসাগরের পার ও তল খুঁজতে পদে পদে অসংখ্য মৃত্যুর সম্মুখীন, সেখানে আমরা মানুষের মধ্যে জ্ঞানবৃত্তির "মহতোমহীয়ান" বা বিভূতি দেখতে পাই, আবার যেখানে মানুষ সমাজ-জীবনের কাম্যবস্তুর পবিত্রতা রক্ষার জন্য—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, জাতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির সম্পর্কে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, কোন ত্যাগকেই যথেষ্ট বলে মনে করে না, বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে অন্ধকার পথে একলা চলে, রক্তরাঙ্গা চরণতলে সমস্ত পথের কাঁটা দলে একা একাই এগিয়ে যায়—সমস্ত বাধা দুর্যোগ দুঃখ-কষ্টকে এমন কি প্রাণকেও তুচ্ছ মনে করে, সেখানেও আমরা মানুষের নৈতিক-শক্তির তেজ দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ না হ'য়ে পারিনে। আবার যেখানে মানুষ জীবনরহস্যকে নিঃশেষে অধিগত করবার জন্য, পরমপুরুষার্থ লাভ করবার জন্য সংসার-সমাজের সমস্ত বাধা সমস্ত লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে সব ভোগবাসনা ত্যাগ করে অনন্য মনে একাগ্র সাধনায় নিরত থাকে, এক কথায় আধ্যাত্মিক আর্তির মূর্ত বিগ্রহে পরিণত হয়, সেখানেও আমরা মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার এক ঐকান্তিক রূপ দেখে মুগ্ধ হই। মানুষের মহত্ত্ব সেখানেই যেখানে মানুষ জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে উর্জ্জস্বী—সেই মানুষই মহীয়ান যার মধ্যে সমস্ত বৃত্তির অতিবিকাশে 'মানবমহিমার ঈশ্বর' অভিব্যক্ত হয়। জ্ঞান-প্রেম-কর্মের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ বা বিভূতি ব্যক্ত হয়।

মানুষের জগতের পাশেই, মানুষেরই-গড়া একটি নতুন জগৎ দেখা দিয়েছে—মানুষের আত্মসংস্কৃতির জগৎ—শিল্পের জগৎ। এ জগতেও 'অণোরনীয়ান

মহতো মহীয়ান' সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়েছে বিষয়ীর শক্তি এবং বিষয়ের প্রকৃতির সংযোগের ফলে। রূপ-ভাব ও ভাবনার অধিকতর সংশ্লেষে ও সমবায়ের ফলে এ জগতেও ব্যক্তিভেদ ঘটেছে। এক মেরুতে দেখা দিয়েছে অল্প রূপ-ভাব-ভাবনাময় রচনাগুলি, অন্য মেরুতে রয়েছে—বহু রূপ-ভাব-ভাবনার বৃহৎ ও বৃহত্তর সমাবেশ—মহান্ মহান্ সৃষ্টিগুলি। বিষয়ের যে যে উপাদান থাকায় মানুষ প্রকৃতির মধ্যে জীবজগতে এবং মানুষের জগতে মহত্ত্ব ও মহীয়ানত্ব উপলব্ধি করেছে এই জগতেও সেই সেই উপাদানের সংযোগেই মহত্ত্ব ও মহীয়ানত্ব উপজাত হয়। শিল্পী তাঁর প্রতিভাবলে সৃষ্টির মধ্যে উৎকৃষ্ট ও বিচিত্র রূপ-ভাব ও ভাবনার যত বেশী সংশ্লেষ ঘটাতে পারেন তত তাঁর সৃষ্টি মহত্ত্বলাভ করে এবং মহত্ত্বের মাত্রাধিক্যে তত তা 'মহতো মহীয়ান' হ'য়ে ওঠে। বহু রূপের সংশ্লেষের ফলে একদিকে সৃষ্টির আয়তন যেমন বৃদ্ধি পায়, বহু ভাবের বিচিত্র সুষ্ঠু এবং ঐকান্তিক অভিব্যক্তি, তেমনি সৃষ্টির প্রাণবত্তার মাত্রা এবং আত্মিক মহিমা বৃদ্ধি করে,—সৃষ্টি দেহে-মনে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে।

একথা অবশ্য-স্বীকার্য যে যেখানেই আমরা বিভূতিমান্ এবং ঊর্জিত সত্তা দেখি, সেইখানেই আমরা শক্তির অতিরূপ দেখে বিস্ময়-বিমুগ্ধ বা আতঙ্কিত-বিস্মিত হয়ে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন—কেন এমন হয়? কেন ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আমাদের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও ধারণা সৃষ্টি করে? এই প্রশ্নটিকেই, প্রকৃত প্রস্তাবে, এই ভাবে উত্থাপিত করা যায়—মহত্ত্ব-বোধের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কি?

আগেই বলা হয়েছে—মহত্ত্ব বা লঘুত্ব বোধবিশেষ এবং অন্যান্য বোধের মতোই সচেতন মানুষের বিশেষ একপ্রকার মানসিক অবস্থা। এই মানসিক অবস্থা বা বোধ, শুধু কেবল বিষয়াকারা প্রতীতিমাত্রই নয়—শুধুমাত্র বিষয়ের গ্রহণটুকুই নয়, এর সঙ্গে ভাবাবেগেরও যোগ থাকে। কারণ, প্রত্যেক বোধের মধ্যেই জ্ঞান এবং ভাব ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। এই হিসাবে, বোধ ব্যাপারটি প্রতীতি-গ্রহণের পরবর্তী মানসিক ক্রিয়া—অর্থাৎ প্রতীতি-রূপী বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর বিশেষ ধরনের মনোভাব। অন্যভাবে বলা যায়—প্রত্যেক বোধ-ব্যাপার, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছাবৃত্তি নিয়ে সর্বাত্মক সংযোগ-স্থাপন বা ব্যবহার।

এই কথাটা বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে বেশী বা কম ভাব ও ইচ্ছা জেগে থাকে। কোন ক্ষেত্রে তা সংলক্ষ্য হয়, কোন ক্ষেত্রে বা অসংলক্ষ্যই থেকে যায়। যেখানে বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা আন্দোলিত হয়ে উঠে আবেগাকার ধারণ করে এবং কর্মেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে বিষয়ীকে প্রেরণা দেয়, সেখানে জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের বা ইচ্ছার সম্পর্কটি সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর যেখানে ভাবের ও কর্মের আবেগ হয় না, সেখানে সম্পর্কটি অসংলক্ষ্য থেকে যায়; মনে হয়—তেমন কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু আসল কথা এই যে, প্রত্যেক জ্ঞাত বিষয়ই বিষয়ীর বাসনায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে; কোনস্থলে প্রতিক্রিয়া বেশী হয় কোনস্থলে কম হয়, এই যা পার্থক্য। এই প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে আমরা চিত্তের মধ্যে মোটামুটি দুটো মেরু কল্পনা করতে পারি ঃ—এক মেরুতে—বিষয়ীর চিত্ত উদাসীন অন্য মেরুতে চিত্ত সব চেয়ে উত্তেজিত বা কৌতূহলী—তীব্রতম সংবেদনায় স্পন্দিত। উদাসীন অবস্থায় চিত্তে বিষয়ের রূপটি প্রতিভাত হয় বটে কিন্তু কোন কৌতূহল বা ভাব জাগায় না। এই অবস্থাকে আমরা প্রতিক্রিয়ার অসৎকল্প (negative) অবস্থা বলতে পারি।

এই উদাসীন অবস্থার সীমারেখা অতিক্রম করলেই প্রতিক্রিয়ার বিষয় বিষয়ীর আগ্রহের বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করে, বিষয়ী বিষয়কে নানা দিক থেকে যাচাই করে দেখতে থাকে—বিষয় সম্পর্কে বিষয়ীর যত রকম আগ্রহ (interest) সম্ভব, তাদের কোন না কোন এক আগ্রহ মনে প্রধান হয়ে ওঠে। একাধিক আগ্রহও না জাগতে পারে এমন নয়। যেখানে আগ্রহ একাধিক, সেখানে যুগপৎ মিশ্রিত ভাবের উদ্রেক ঘটতে পারে। যাই হোক—বিষয়ীর আগ্রহের মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্যের উপরেই যে প্রতিক্রিয়ার মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে—এ কথাটাই বিশেষভাবে এখানে মনে রাখতে হবে।

এক হিসাবে এই আগ্রহের (interest) প্রশ্নটিই প্রকৃত প্রস্তাবে আসল আলোচ্য বিষয়। কারণ এই আগ্রহের রূপ-রূপান্তরের মধ্যেই ব্যক্তির মনোভঙ্গির (attitude) রূপ-রূপান্তর নিহিত এবং মনোভঙ্গীর (attitude) মধ্যে তাত্ত্বিক দৃষ্টি, নৈতিক দৃষ্টি, এবং শৈল্পিক-দৃষ্টি প্রভৃতি দৃষ্টির ব্যাখ্যা ও বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। অতএব, আগ্রহ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে—

কোনও তত্ত্বকেই ঠিকভাবে জানা সম্ভব হবে না। বলা বাহুল্য হলেও বলে নেওয়া দরকার—আগ্রহ বাসনাময় অর্থাৎ বাসনাই নানা আগ্রহের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রথমতম এককোষী প্রাণী থেকে বাসনার ইতিহাস পাঠ করতে গেলে দেখা যাবে—জীবের মৌলিক বাসনা—আত্মরক্ষার এবং আত্মপ্রজননের প্রবৃত্তি। তার মধ্যেও, আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি মৌলিকতম। কথায় বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। প্রথমতম প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত—প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টাই সাধারণ এবং প্রধান চেষ্টা। প্রেয় বা শ্রেয় রক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার নিদর্শন যথেষ্ট থাকলেও অসাধারণ ঘটনার মধ্যেই সে সব অন্তর্ভুক্ত। প্রাণীর মধ্যে, পরিবেশের মধ্যে, প্রাণের অনুকূল বা প্রতিকূল যা যা আছে তাদের চিহ্নিত করে রাখবার এবং অনুকূলকে গ্রহণ প্রতিকূলকে বর্জন করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চলেছে—। বিষয়ের কাছে প্রাণের প্রথম জিজ্ঞাসা—কে তুমি? শত্রু না মিত্র? বিষয় উপস্থিত হলেই প্রাণ তাকে পরীক্ষা না করে পারে না। পরিচিত মহলে কে শত্রু কে মিত্র চিহ্নিতই থাকে; কিন্তু অপরিচিত মহলে বা পরিচিতও যেখানে তার অদ্ভুত আচরণে সংশয় জাগিয়ে দেয় সেখানে, আতঙ্কিত প্রাণ কৌতূহলের সংগীন উচিয়ে জিজ্ঞাসা করে—কে তুমি? নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি কোথায়? আত্মরক্ষাই যেখানে প্রধান প্রবৃত্তি, সেখানে এ কথা অবশ্যই বলা যায় আত্মরক্ষার সঙ্গে যে বস্তুর যত নিকটতর সম্পর্ক—শত্রু সম্পর্কই হোক আর মিত্র সম্পর্কই হোক—বিষয়ীর কাছে সেই বস্তুর তত গুরুত্ব। অর্থাৎ সেই বস্তু সম্বন্ধে বিষয়ী তত আগ্রহী—তাকে গ্রহণ অথবা বর্জন করবার জন্য বিষয়ী তত একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করে। যে অনুপাতে এই ঐকান্তিকতা সেই পরিমাণেই বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

মনোজৈবিক প্রাণী মানুষের আত্মার বৃত্তের পরিধি শুধু প্রাণ ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায়,—মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তিরও বড় মর্যাদা স্বীকৃত। ফলে মানুষের আত্মরক্ষা বলতে শুধু প্রাণরক্ষাই বুঝায় না, সামাজিক জীবন যাপন করতে গিয়ে মানুষ যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্যের বা মূল্যের জগত গড়ে তুলেছে এবং যে মূল্য নিয়ে সে মনুষ্যত্বের অভিমান পোষণ করে সেই মানবিক মূল্য রক্ষাও বুঝায়। তাই মানুষের সমাজে প্রাণরক্ষা এবং মানরক্ষা সমান গুরুত্বপূর্ণ। যে বিষয় প্রাণের পক্ষে ক্ষতিকর বা বৃদ্ধিকর

সে যেমন গুরুত্ব পায়, তেমনি যে বিষয় মানের পক্ষে, মনুষ্যত্বের মূল্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা বৃদ্ধিকর তা'ও সমান বা অধিকতর গুরুত্ব পেয়ে থাকে। দেহের মৃত্যু বিনষ্টি বটে কিন্তু মনের মৃত্যু, আত্মার মৃত্যু, মহতী বিনষ্টি। জীবনরক্ষার জন্য ঐকান্তিক সংগ্রামে—প্রাণশক্তির মহত্ত্ব প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু মানবিক মূল্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামে তার আত্মার মহত্ত্ব ব্যক্ত হয়। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে—আত্মরক্ষার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার (সংকীর্ণ এবং ব্যাপক) অর্থ সঙ্গে যুক্ত হয়েই বিষয় গুরুত্বলাভ করে থাকে। সেই ঘটনাকেই বা বিষয়কেই মানুষ গুরুত্বপূর্ণ (Serious) ব'লে মনে করে যা আত্মরক্ষার তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত হয়ে থাকে। এই যোগ যে বিষয়ে যত কম সেই বিষয় বা ঘটনা তত লঘু বলে বিবেচিত।

বাস্তবিক, অভিযোজন প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি বিচার করে দেখতে গেলে (এইদিক থেকে না দেখলে ঠিকভাবে দেখাও হবে না) দেখা যায় যে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর ইন্দ্রিয়-সংযোগ ঘটার পরে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতীতি হওয়ার পরে প্রথমেই বিষয়ী বিষয়ের মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটানোর শক্তি সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাতে বিষয় সম্পর্কে বিষয়ীর প্রথম আগ্রহ প্রকাশ পায়। তারপর দেখা দেয় অন্য আগ্রহ। যেখানে আগে থেকেই বিষয়ের প্রকৃতি জানা থাকে সেখানে এই" হিসাব প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই নিকাশ হয়ে যায় এবং বিষয়ীর মনে অন্যান্য আগ্রহের জন্য অবকাশ প্রস্তুত হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে তা হয় না সেখানে ঐ হিসাব না ক'রে বিষয়ী এক পাও অগ্রসর হতে পারে না ; কারণ আত্মরক্ষার তাগিদের চেয়ে বড় তাগিদ আর কিছু নেই। এই আত্মরক্ষার মৌলিক চেষ্টা থেকেই জীব প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে অভিযোজন করে চলেছে। এই অভিযোজন প্রয়াসের ফলেই, প্রাণিজগতে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ ঘটেছে। এই বিবর্তনের ফলেই বিবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের জন্ম হয়েছে এবং জীবের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের শক্তি অনুসারে পরিবেশের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ গ্রহণ করবার সামর্থ্য দেখা দিয়েছে। মানুষের পর্যায়ে, এই সামর্থ্য এমন এক স্তরে পৌঁছেচে যে মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয়কে শুধু গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, বিষয়ের স্বরূপ এবং পারস্পরিক কার্যকারণ যোগ আবিষ্কার করতেও চেষ্টা করেছে। সংক্ষেপে বলা চলে—

মানুষের বিষয় সম্বন্ধে নতুন নতুন আগ্রহ দিখা দিয়েছে। এই নতুন আগ্রহের একটি হচ্ছে—তত্ত্ব-গ্রহণের আগ্রহ; অন্যটি হচ্ছে—রূপ ধ্যান করার আগ্রহ। আত্মরক্ষার মূল আগ্রহ থেকেই এদের জন্ম বটে, এবং অভিযোজনের সঙ্গেই সমস্ত আগ্রহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত বটে, কিন্তু বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের সম্ভাবনা থাকায়, 'অহং-এর' স্বতন্ত্র অভিপ্রায় অনুসারে আগ্রহও স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে। জানার আগ্রহ যেখানে অভিযোজনের বাসনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থেকে, বিশুদ্ধ জানার বাসনা রূপে প্রকাশ পায়, সেখানেই জ্ঞানবৃত্তি স্বাধীন-অনুশীলনের পথে এগিয়ে যায়। সেই অবস্থায় বিষয়ী বিষয়ের উপযোগিতা বা রূপ-সুষমার জন্য আগ্রহশীল নয়, তখন সমস্ত আগ্রহ তার বিষয়ের 'তত্ত্ব'টুকু জেনে নেওয়ার জন্য নিয়োজিত। সেখানে যেটুকু রূপ-বিচার এবং উপযোগিতা বিচার থাকে, তা তত্ত্ব জিজ্ঞাসার সহায়ক উপায় হিসাবেই স্থান পেয়ে থাকে। তেমনি রূপের আগ্রহ সেখানে অভিযোজন-বাসনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থেকে রূপ-সুষমা সম্ভোগের ইচ্ছা রূপে ব্যক্ত হয়, সেখানেই রূপ-সম্ভোগ প্রবৃত্তি স্বাধীন অনুশীলনের আগ্রহে কল্পনার রূপ পরিগ্রহ করে। রূপের আগ্রহ যেখানে প্রবল সেখানে বিষয়ীর কাছে বিষয়ের অন্যান্য আবেদন গৌণ হয়ে যায়। এই মনোভঙ্গীকেই বলা হয়ে থাকে বিশুদ্ধ শৈল্পিক মনোভঙ্গী (aesthetic attitude)। এই মনোভঙ্গী নিয়েই শিল্পীরা শিল্প সৃষ্টি করেন এবং এমনি মনোভঙ্গী নিয়েই শিল্পরসিক শিল্প আস্বাদন এবং সৌন্দর্য সম্ভোগ করে থাকেন।

দেখা গেল—বিষয় সম্বন্ধে বিষয়ীর আগ্রহ এই কয় রূপ নিতে পারে :—
(১) উপযোগ জিজ্ঞাসা, (২) তত্ত্ব জিজ্ঞাসা (৩) রূপ বা রস-সম্ভোগ।

উপযোগ জিজ্ঞাসার দুই রূপ। এক রূপে—বিষয় মঙ্গলকর কি অমঙ্গলকর—এই জিজ্ঞাসা, অন্য রূপে—(অবশ্য এই রূপেরই বিশেষরূপে) বিষয় ব্যবহারিক জীবনে কোন্ কাজে লাগবে না লাগবে তার হিসাব। উপযোগ-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বিষয়ের শিবত্ব অশিবত্ব এবং প্রয়োজনীয়ত্ব অপ্রয়োজনীয়ত্ব, তত্ত্ব-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বিষয়ের সত্যত্ব মিথ্যাত্ব—এবং রূপ বা রসদৃষ্টিতেই—ধরা পড়ে বিষয়ের সুন্দরত্ব-অসুন্দরত্ব। তবে রসদৃষ্টি মূলতঃ সৌন্দর্যসন্ধানী হ'লেও সৌন্দর্য সত্য-শিব সাপেক্ষ ব'লে রসদৃষ্টিতে বাসনার দ্বিমুখী অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়। একদিকে থাকে সুষমা বা সৌন্দর্যের অভিপ্রায়, অন্যদিকে থাকে—

লঘু গুরু বিচার ভূমার ও অল্পের বিচার। অর্থাৎ রূপ দৃষ্টির তথা রসদৃষ্টির কাছে জগৎ দুই বোধে ধরা পড়ে থাকে—একে সুষমাবোধ—সুন্দর-অসুন্দরের বোধ ; অন্যে—ভূমার ও অল্পের বোধ। রূপানুরাগী মনোভঙ্গী রূপ-সুষমার চেতনার ও উপলব্ধির সঙ্গে মিলিত হয়ে—সৌন্দর্য বোধে পরিণত হয়, আর রূপানুরাগী মনোভঙ্গী বিরাটরূপজনিত বিস্ময়-বোধের সঙ্গে মিলিত হয়ে—ভূমা বোধে (sublimity) পরিণত হয়। মহত্ত্ববোধকে যদি বলা যায় রূপানুরাগে মহান বস্তুর ধ্যান, ভূমাবোধ বা মহীয়ান-বোধকে বলা যেতে পারে—রূপানুরাগে অনন্ত সান্তের বিরাট রূপের ধ্যান।

এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করতে সৌন্দর্য ও মহীয়ানত্ব সম্বন্ধে ইউরোপীয় সাহিত্যদর্শনে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মুখ্যতঃ মহীয়ান "সাবলাইম"—সম্বন্ধে প্রথম যিনি আলোচনা করেছেন—তিনি হচ্ছেন খ্রীঃ তৃতীয় শতাব্দীর লঙিন (Longinus) তাঁর গ্রন্থ—'অন দি সাবলাইম' আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়ে থাকে। এ শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্যও বটে। লঙিন যে 'সাবলাইম'-এর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন তা শিল্পের মহত্ব (sublimity)। তাঁর বক্তব্য—শিল্প মহত্ত্বের অধিকারী হয় তখনই যখন শিল্পের মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভাব (conception), ঐকান্তিক তীব্র আবেগের সঙ্গে এবং নিখুঁত সুষমায় ও ঔচিত্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। চিত্তচমৎকারী মহান শিল্পের পক্ষে—মহান ভাববস্তু, প্রকাশের ঐকান্তিক আবেগ, এবং নিখুঁত গঠন-সুষমা—এই তিনটিই অপরিহার্য। এই তিনটি উপকরণ ছোট প্রতিভার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। বড় প্রতিভার পক্ষেই এই ধরনের সৃষ্টি সম্ভব এবং সেই মহাকবির পক্ষেই সম্ভব যাঁর আত্মার মধ্যে—"invincible yearning for all that is great, all that is diviner than ourselves"—সদা জাগ্রত রয়েছে। এই জাতীয় মহান আত্মার সৃষ্টি অবশ্যই—"image of greatness of soul" হবে, দৈবশক্তির মতোই মহাকবির শক্তি বিরাটের সৃষ্টিকর্তা।

এর পর আমরা বার্কের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করতে পারি। বার্ক তাঁর—"Philosophical Enquiry into our Idea of the Sublime and the Beautiful"—গ্রন্থে 'সুন্দর' এবং 'মহীয়ান'—সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা

করেছেন। সৌন্দর্য বলতে তিনি বুঝেন— That quality or those qualities in bodies by which they cause love or passion similar to it"। সৌন্দর্য নিহিত থাকে অঙ্গ-সুষমার মধ্যে—অঙ্গীর সঙ্গে অঙ্গের সুসমঞ্জস সম্বন্ধের মধ্যে—proportion of parts মধ্যে। সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে কোন বুদ্ধি বিচারের প্রয়োজন নেই, ইচ্ছা শক্তির একাগ্র অধ্যবসায়েরও কোন প্রয়োজন নেই। সৌন্দর্যে বস্তুর পরিমাণের বা আয়তনের কোন গুরুত্ব নেই—কি ভাবে বস্তু গৃহীত হয় তার উপরেই সৌন্দর্য নির্ভর করে। অন্যপক্ষে মহত্ত্ব-বোধ সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা ভিন্ন স্তরের উপলব্ধি। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই—Ideas of the sublime and the beautiful stand on foundations so different that it is hard, I had almost said, impossible, to think of reconciling them in the same subject without considerably lessening the effect of the one or the other upon the passions,......"

বার্কের মতে—সৌন্দর্য-বোধ জাগে অপেক্ষাকৃত ছোট বস্তু—মসৃণ, চিক্কণ বিচিত্র ভঙ্গিমে বস্তু আশ্রয় করে, সৌন্দর্যবোধের ভাবিক ভিত্তি—অনুরাগ (love) আর মহত্ত্ব বোধ জাগে বিরাট বস্তু আশ্রয় করে—তার ভিত্তি—সম্ভ্রম শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় (reverence, respect, astonishment) এবং তারও মূলে থাকে—ভয় (terror)। তিনি বলেন—সুন্দরবস্তু আমাদের বশীভূত ব'লে, তাকে আমরা ভালবাসি আর আমরা মহান বস্তুর বশীভূত ব'লে তাকে আমরা সম্ভ্রম করি—শ্রদ্ধার চোখে দেখি। (We submit to what we admire, we love what submits to us)। যে যুক্তির ভিত্তির উপরে বার্ক তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'তা' এই—"Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain and danger that is to say, whatever is in any sort terrible, or is conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to terror, is a source of the sublime, that is, it is productive of the strongest emotion which the mind is capable of feeling."
"অর্থাৎ যে বিষয় আমাদের মধ্যে বেদনার ও ভয়ের ভাব জাগাতে সক্ষম—

এক কথায় যা ভয়ানক বা ভয়ানককল্প সেই বিষয়ই আমাদের মধ্যে মহত্ত্ববোধ সৃষ্টি করতে পারে, কারণ—সেই বিষয়ই আমাদের মধ্যে যার-পর-নাই তীব্রতম আবেগ জাগাতে পারে। অবশ্য তার বক্তব্য কিন্তু এ নয় যে ভয়ানক মাত্রেই 'মহান' (সাবলাইম)। ভয়ানক আনন্দদায়ক না হওয়া পর্যন্ত—মহত্ত্ববোধ জাগার কোন সম্ভাবনা নেই। এ বিষয়ে তাঁর সূত্র এই যে—Terror is a passion which always produces delight when it does not press too close." "অর্থাৎ ভয়ানক যেখানে নিজের ঘাড়ের উপর না এসে পড়ে সেখানে তা আনন্দদায়কই হয়। বার্ক বলতে চান—মহত্ত্ব-বোধের উদ্দীপক কারণ হচ্ছে ভয়ংকর বস্তু, কিন্তু ঐ বস্তু স্বরূপে ভয়ানক হওয়া সত্ত্বেও, দ্রষ্টার আত্মরক্ষায় ব্যাঘাত ঘটায় না বলে দ্রষ্টার কাছে আনন্দদায়ক হয়ে উঠে। যাই হোক, বার্কের সিদ্ধান্ত এই যে মহত্ত্ব বোধের সৃষ্টিতে 'ভয়'-ভাবটির একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে—"Indeed terror is in all cases whatsoever, either more openly or latently, the ruling principle of the sublime। এই ভয় ভাবটিকে এতখানি গুরুত্ব দেওয়ার মধ্যেই বার্কের মতবাদটির বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে। তার মতে—delightful horror……is the most genuine effect and truest test of the sublime.

মহত্ত্ব-বোধ বিশ্লেষণ ক'রে তিনি তার মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবরাজি আবিষ্কার করেছেন—ভয়ানকত্ব, রহস্যময়তা, ঊর্জস্বিতা, বিশালতা, অনন্ততা, দুর্গ্রাহ্যতা, বিভূতিমত্তা। মহান্ ও সুন্দরকে পাশাপাশি রেখে এই ভাবে তাদের স্ব স্ব ধর্ম নির্দেশ করা যেতে পারে :—

মহান		সুন্দর
১। বিশাল	—	ক্ষুদ্র
২। উচ্চাবচ, রুক্ষ ও অমসৃণ	—	মসৃণ ও চিক্কণ
৩। ঋজু-রেখান্বিত	—	বিচিত্র-ভঙ্গিমা-যুক্ত
(রেখার পরিবর্তন অতিসংলক্ষ্য)	—	(পরিবর্তন অসংলক্ষ্য)
৪। কৃষ্ণাভ ও অনুজ্জ্বল	—	দীপ্তিমান
৫। কঠিন ও বৃহদায়তন	—	লঘু ও অল্পকায়
৬। বেদনা-মূলক	—	আনন্দ-মূলক

বার্কের পর দার্শনিক **ক্যাণ্টের** আলোচনা (১৭৯০) উল্লেখযোগ্য। ক্যাণ্ট মহত্ত্বকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক শ্রেণীতে—আছে সেই সব মহান যারা বিশালতার মহিমায় মণ্ডিত। বিশালতাজনিত মহিমাকেই ক্যাণ্ট—'mathematical sublimity' বলেছেন। অন্য শ্রেণীতে আছে সেই সব মহান যারা শক্তির মহিমায় মণ্ডিত। এই শক্তি মহিমাকে ক্যাণ্ট 'Dynamic sublimity' বলেছেন। মোটকথা সীমাতিশায়ী মহিমা যে দিক থেকেই দেখা দিক—আমাদের মনে মহত্ত্ব বোধ উদ্বোধিত করে থাকে। **হেগেলের** মতে সাবলাইম বোধ দুটি ভাবের সংযোগে সম্ভব হয়—এক 'man's finiteness" (মানুষের সীমাবদ্ধতা) অন্যটি—"insurmountable aloofness of God : (ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা) শিল্পসমালোচক রাসকিন, তাঁর "মডার্ণ পেণ্টার্স" গ্রন্থে (১৯০০) মহত্ত্ববোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে, বার্ক-কথিত মহত্ত্ববোধের মূলে ভয় এবং বেদনার ভূমিকা, সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে—মহত্ত্ববোধ আসলে—effect of greatness on the feelings—greatness whether of matter, space, power, virtue or beauty."। রাসকিনের সিদ্ধান্ত লক্ষণীয় বটে, কিন্তু তাতে "feeling of greatness"—এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

শিল্পদার্শনিক **জে কোহন** (J. Cohn—Allgemeine Aesthetik) (১৯০১) বলেছেন মহত্ত্ববোধের মধ্যে বিশালতার ধারণার সঙ্গে আরো একটি ধারণার মিশ্রণ ঘটে ; সেই ধারণাটি হচ্ছে—বস্তুর আধার এবং আধেয়ের অসঙ্গতি সম্পর্কিত ধারণা—(discrepancy and incompatibility between objects' form and content) একেবারে নতুন কথা না বল্‌লেও কোহন মহাশয় মহান বস্তুর রূপে সুষমার অভাবের দিকে নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর পর প্রসিদ্ধ সমালোচক **এ. সি. ব্র্যাড্‌লে** মহাশয়ের—আলোচনা উল্লেখযোগ্য। ব্র্যাড্‌লে, তাঁর 'Oxford Lectures on Poetry গ্রন্থের (১৯০৯)—The Sublime নামক প্রবন্ধে (১৯০৩) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার মুখপাতেই তিনি—মহত্ত্ববোধের ভাব-উপকরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন—"Astonishment, rapture, awe, even self-abasement are among the emotions evoked by

sublimity."। ব্র্যাড্লের সিদ্ধান্তের প্রথম বিশেষত্ব এই যে তিনি মহত্ত্ববোধকে সৌন্দর্য বোধেরই বিশেষ এক প্রকার ব'লে মনে করছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন—সৌন্দর্য কথাটিকে তিনি বিশেষ অর্থে অর্থাৎ সত্য ও শিব থেকে সুন্দর যে অর্থে পৃথক সেই অর্থে ব্যবহার করেছেন। সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি পাঁচটি শ্রেণী কল্পনা করেছেন :—যেমন—

'Sublime'—'Grand'—'Beautiful'—'Graceful'—'Pretty' এই পাঁচটির মধ্যে বিউটিফুলের স্থান মাঝখানে। এর এক দিকে—'সাবলাইম এবং গ্র্যাণ্ড, অন্য দিকে 'গ্রেসফুল' ও 'প্রেটি'। গ্র্যাণ্ডকে আমরা যদি 'মহান' বলি 'সাবলাইম'কে বলতে পারি—'মহীয়ান'। অবশ্য সুন্দর 'মহান' অপেক্ষা 'গ্রেসফুল' এর দিকেই বেশী ঝুঁকে থাকে। ব্র্যাডলে বলতে চান—মহান্ বা মহত্তমের বিলক্ষণ লক্ষণই হচ্ছে—'greatness'। 'সাবলাইম' সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত—"whatever strikes us as sublime produces an impression of greatness and more—of exceeding or even overwhelming greatness..........remove the greatness in imagination and the sublimity vainshes" এই "greatness" শুধুমাত্র আয়তনগত বা পরিমাণগত বৃহত্বই নয় ; অন্য ভাবেও অর্থাৎ ছোট আকারের পদার্থের মধ্যেও এই 'greatness'—এর সাক্ষাৎকার পাওয়া যেতে পারে। টুর্গেনেভের একটি গদ্য কবিতা অনুবাদ করে—চড়াই পাখীর দৃষ্টান্তটি দেখিয়েছেন। অনুবাদটির অনুবাদ এখানে দিলাম

"শিকার করে বাড়ী ফিরছিলাম এবং বাগিচার পথ ধরে আসছিলাম। আমার কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছিল।

হঠাৎ কুকুরটার চলার গতি কমে গেল যেমন করে শিকার দেখে পা টিপে টিপে এগোয় তেমনি করে চলতে লাগল। পথটার দিকে আমি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম—একটা চড়ুইয়ের বাচ্চা পড়ে আছে, জোর বাতাসে বাসা থেকে পড়ে গেছে ; চুপ করে ব'সে আছে, মাঝে মাঝে ঈষদুদ্গত ডানা মেলে উড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

কুকুরটা তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—দেখেই গাছের উপর থেকে একটা বুড়ো চড়ুই পাখী ঝপ করে কুকুরটার নাকের কাছে এসে পড়েই আর্তস্বরে প্রাণপণ চীৎকার করতে করতে, বড় বড় দাঁত বের করা হা করা কুকুরটার

মুখের প'রে গিয়ে ঝাপটা মারতে লাগল। বাচ্চার প্রাণ বাঁচাতে হবেই। নিজের দেহ দিয়ে বাচ্চার দেহ ঢেকে বসে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল আর আর্তনাদ করতে থাকল। আর্তস্বর মিলিয়ে গেল। সে আত্মত্যাগ করল।

কুকুরটা তার কাছে নিশ্চয়ই বড় একটা দৈত্যের মতোই মনে হয়েছিল। তবু সে নিশ্চিন্তে গাছের ডালে বসে থাকতে পারেনি। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির চেয়েও বড় একটা শক্তি তাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে এনেছিল।

আমার কুকুরটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল এবং অস্বস্তি নিয়ে ফিরে এল। সেও নিশ্চয় ঐ শক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছিল। তাকে আমি কাছে ডেকে নিলাম। আমার মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগল।

হ্যাঁ, হেসো না। সত্যিকারের শ্রদ্ধাই জেগেছিল—ঐ ছোট্ট অথচ ধীর পাখীটির উপর—তার ভালবাসার ঐকান্তিক আবেগের উপর।

মনে হ'য়েছিল ভালবাসা মৃত্যুর চেয়েও প্রবল, মৃত্যুভয়ের চেয়েও বলবান। ভালবাসাই জীবনের একমাত্র আশ্রয়, ভালবাসাই জীবনকে একমাত্র চালিয়ে নিয়ে চলেছে।"

এই চড়াই পাখীটি অবশ্যই মহিমময়। কিন্তু নিশ্চয়ই বৃহদায়তনের জন্য তাঁর এই মহিমা নয়। এ মহিমারও মূলে আছে—"exceeding or overwhelming greatness—a greatness however, not of extension but rather of strength or power and in this case of spiritual power."

ব্র্যাডলে দেখাতে চেয়েছেন—আপাতদৃষ্টিতে যেসব 'সাবলাইম'-এর ক্ষেত্রে "exceeding and overwhelming greatness" চোখে পড়ে না—যেমন রাত্রির নিস্তব্ধতা, ঝড়ো বা ঝড়ের মতো গানের হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া, মৃত্যুর নিস্তব্ধ অসাড়তা, সেখানেও, একটু তলিয়ে দেখলেই—ঐ 'greatness' পাওয়া যাবে। তারপর সমালোচকপ্রবর 'সাবলাইম'-বোধে মনের অবস্থা কিরূপ হবে তা' নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং পূর্ববর্তীদের বিশেষতঃ বার্কের এবং ক্যাণ্টের সিদ্ধান্ত স্মরণ করেছেন। এই আলোচনায়—তিনি নিজের দেওয়া সংজ্ঞার "overwhelming" বিশেষণটি বিশ্লেষণ করতেই চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে—সৌন্দর্যবোধ এবং 'সাবলাইম'-বোধের মধ্যে পার্থক্য আছে। সৌন্দর্যবোধের সময় চিত্ত থাকে আনন্দময় নির্বাধ, বিস্ফারিত,

সৌন্দর্যবোধে সুন্দর বস্তু এবং আমাদের চেতনার মধ্যে সানন্দ সামঞ্জস্য থাকে। এবং সুন্দরের সঙ্গে আমাদের সহজ অনুভূতির বা অনুরাগের সম্পর্ক। অন্যপক্ষে 'সাবলাইম'-বোধ এত সরল ও অবাধ ব্যাপার নয়। 'সাবলাইম' প্রথমে আমাদের বেশ একটু ধাক্কাই দিয়ে থাকে—মুহূর্তের জন্যে দিলেও দেয়। সাবলাইমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রথমেই চিত্ত বেশ একটু বাধাগ্রস্ত, পরাভূত বিমূঢ়, ব্যাহত বা আশঙ্কিত হয়—যেন বস্তুটি এমন কিছু যাকে আমরা সহজে গ্রহণ করতে—ধারণা করতে, বা সহ্য করতে পারিনে।

এখানেই, অবশ্য 'সাবলাইম' বোধের সমাপ্তি নয় এর পরেই ঘটে আর এক মানসিক ব্যাপার—"a rush of self-expansion, or an uplifting, or a sense of being borne out of the self, that was checked or even of being carried away beyond all checks and limits." :—আত্ম সম্প্রসারণের হঠাৎ আবেগ, ঊর্ধ্বায়ন বা বাধাবন্ধশূন্য আত্মহারা ভাব। এখানে পৌঁছেই সাবলাইম-বোধ সম্পূর্ণ। তবে এই অবস্থাতেও চমৎকারবোধ বা শ্রদ্ধানুরাগের সঙ্গে বিস্ময় মিশে থাকে। 'সাবলাইম'-বোধ সরল-সহজ নয় এবং সাবলাইম প্রথম অবস্থায় মনে ধাক্কা দেয়—এসব মানলেও, ব্র্যাডলে বার্কের মতো এ কথা বলতে রাজি নন যে—ধাক্কার কারণ 'ভয়'—প্রত্যেক সাবলাইম-বোধের মূলে 'ভয়ের' ভাব থাকে। অর্থাৎ তিনি এ কথা মানতে চাননি যে "overwhelming" হতে গেলেই ভয়ংকর হতে হবে। ইন্দ্রধনু, উদার সূর্যোদয় নক্ষত্রখচিত রাত্রির আকাশ, সক্রেতিস বা টুর্গেনেভের চড়াই পাখী প্রভৃতির বেলায় যে বাধা (cheek) তাকে নিশ্চয়ই ভয়ের বাধা বলা চলে না। অবশ্য 'ভয়' কথাটার অর্থ ব্যাপকতর করে নিলে—স্বতন্ত্র কথা। সাবলাইমের আর একটি বিশেষত্বের দিকে ব্র্যাডলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন—'greatness'-এর বিশেষণ exceeding or overwhelming বদলে, 'immeasurable' or 'incomparable' or 'infinite' দেওয়ার আবশ্যকতা আছে কি? এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এই যে—"the greatness is only sometimes immeasurable but it is always unmeasured. We can not apprehend an object as sublime while we apprehend it as comparably, measurably or finitely great."। সাবলাইম-বোধের মুহূর্তে পরিমিতিবোধ, তুলনা-চেতনা, সান্ত-অনন্ত

বিচার স্থগিত হয়ে যায়। স্থগিত থাকা এক কথা আর আদৌ না থাকা আর এক কথা—এ কথাটাও ভুলতে নিষেধ করেছেন। আনন্ত্যের দ্যোতনা শুধু সাবলাইমেই থাকে না—সুন্দরেও থাকে। সুন্দরে অনন্ত খণ্ড পরিচ্ছিন্নরূপে ব্যক্ত আর সাবলাইমে অনন্ত অখণ্ড অসীমরূপে প্রকাশিত। সুন্দর "the image of its immanence, সাবলাইম—"the image of its transcendence"।

James Sully-র মতে—'সাবলামিটি'—হচ্ছে বিরাটবস্তুর উপস্থাপনাজনিত অথবা বিরাটের ভাবব্যঞ্জনাজনিত বিশেষ এক রকম ভাবাবেগ।

M. Dessoir আনন্ত্যের দ্যোতনার উপর বেশী জোর দিয়েছেন। A critical History of Modern Aesthetics : (1933) গ্রন্থের লেখক Listowell মহাশয় এঁর মত আলোচনা করতে যেয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন—"extensive or intensive size should be so great as to border the infinite"। এই ধরনের কথা আগে অনেকেই বলেছেন। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। নতুন কথা পাওয়া যায়—Einfuhlung মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি—T. Lipps-এর 'Asthetik'-গ্রন্থে। ব্যক্তিগত বাসনার পরিপূরণের উপর এঁদের ঝোঁক বেশী। এঁরা বলেন শিল্প-কর্মের মধ্যে শিল্পরসিক নিজেরই জ্ঞান অনুভব-কর্ম প্রভৃতি বাসনার রূপ সাক্ষাৎকার করে আত্মোপলব্ধি করে তথা আনন্দলাভ করে। Lipps-এর মতে—সাবলাইম বস্তুর মধ্যে আমরা "feeling of our own power, the swollen strength of our own volition, which we project spontaneously into the object". অর্থাৎ যে বস্তু চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আমাদের শক্তিমত্তাকে—আমাদের ইচ্ছাশক্তির অতিস্পর্ধী রূপটিকে উপলব্ধি করি, সেই বস্তুকেই আমরা 'সাবলাইম' বলে ঘোষণা করে থাকি।

সাবলাইম সম্বন্ধে এর পর অনেকেই অনেক কথা বলেছেন বটে, কিন্তু কেউই নতুন কোন কথা বলতে পারেননি ; পুরাণো সিদ্ধান্তেরই কোন-কোন অংশে ঝোঁক দিয়েছেন। যেমন—O, Kulpe—(Grundlagen der Asthetik—1921), যখন বলেন—সাবলাইম হচ্ছে—'Overwhelming greatness'-জনিত ভাবাবেগ, তখন নিশ্চয়ই নতুন কথা বলেন না। V. Vasch (Essai Critique sur l—Esthetique de Kant—1927) যখন—সাবলাইমকে মিশ্রভাবাত্মক বলেন—"the mingling of initial

pain and subsequent pleasure as well as quantitative greatness that distinguishes the category of the sublime from that of the beautiful (Listwell)-তখনও বার্কের আলোচনার গণ্ডীর বাইরে যান না। অথবা J. Volket (Asthetic—Voll II 1927) —যখন বলেন—'Sublime depends on the abnormal size of the aesthetik object'—তখনও কোন নতুন তত্ত্ব পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য দার্শনিক ক্যাণ্ট যাকে 'পরিমাণ মহত্ত্ব (mathematical sublimity) বলেছেন—Volket তারই উপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন শিল্পবস্তুর অতিকায়ত্বকেই তিনি মহত্ত্ব-চেতনার নিমিত্তকারণ বলে নির্দেশ করেছেন।

এ পর্যন্ত মহত্ত্বের বা মহীয়ানত্বের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারা যাচ্ছে যে লৌকিক জগতে এবং অলৌকিক শিল্পের জগতে সেই বস্তুই মহীয়ান যা তার বিস্ময়জনক বিস্তার এবং ভাবগভীরতা দিয়ে আমাদের মধ্যে বিস্মিত উল্লাস সৃষ্টি করে। যা' একাধারে পরিমাণে বা আয়তনে বিরাট এবং প্রকৃতিতে অর্থাৎ বিষয়-গৌরবে বিভূতিমান এবং বিষয়ের অভিব্যক্তিতে উর্জস্বী। ক্যাণ্টের পরিভাষায় বলতে যা একাধারে mathematically এবং dynamically great—যার বিরাট আয়তন চেতনাকে বিস্ফারিত করে দেয় বিস্ময়ের সীমায়, যার শক্তির বিভূতি জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছা বৃত্তিময় চিত্তকে গভীর আলোড়নে আলোড়িত ক'রে চমৎকৃত করে,—মহানুভবজনিত উদ্দীপনায় উল্লসিত করে। ব্যাপ্তির ও বিভূতির এক মহাসমন্বয়ে মহীয়ানের সংস্থিতি।

॥ ২ ॥

মহাকাব্যের জন্ম

সংস্কৃত একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—

নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যাতত্র সুদুর্লভা
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা ॥

অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম হয় জীবের বহু ভাগ্যের ফলে, আরো ভাগ্যবান হলে তবে মানুষ বিদ্যালাভ করতে পারে ; কিন্তু বিদ্বান হ'লেই মানুষ কবি হয় না, বিদ্বানদের মধ্যে খুব অল্প লোকই কবি, সুতরাং কবিত্ব আরো দুর্লভ। এবং কবি মাত্রেই শক্তিমান ন'ন ; দুচার জনের মধ্যেই শক্তি দেখা যায়, এই কারণে শক্তিমান কবি আরো দুর্লভ—সুদুর্লভ। এই বচনের সঙ্গে আরো একটু যোগ করে আমরা বলতে পারি—শক্তির মধ্যেও তারতম্য আছে ; শক্তিমান সুদুর্লভ বটে শক্তিমত্তর আরো সুদুর্লভ এবং শক্তিমত্তম অতি সুদুর্লভ—বলা যেতে পারে শক্তির অর্থাৎ কবি প্রতিভার পূর্ণাবতার। প্রতিভা যদি হয় "অপূর্ববস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা" মহাশক্তিধর হচ্ছেন প্রজ্ঞার বিভূতিমান বিগ্রহ।

আগেই বলা হয়েছে জগতে শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ সম্ভব হয়েছে—এবং তারই ফলে জগতে বিচিত্র বস্তু এবং প্রাণীর উৎপত্তি ও স্থিতি সম্ভব হয়েছে। আসলে সৃষ্টি মানেই অব্যক্তের ব্যক্তীভবন ব্যক্তিরূপে—বিশিষ্ট একটি শক্তিক্ষেত্র রূপে পরিণতি এবং অবস্থিতি। অজৈব জগৎ থেকে মনুষ্য জগৎ পর্যন্ত সর্বত্রই ব্যক্তিবৈচিত্র্যে সৃষ্টির বৈচিত্র্য—শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শক্তির তারতম্য বর্তমান। মনোজৈবিক মানুষ হিসাবে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে গ্রহণ, স্মরণ-কল্পন-মনন প্রভৃতি বৃত্তি আছে বটে কিন্তু প্রত্যেকের গ্রহণশক্তি, ধারণা শক্তি, স্মরণ শক্তি, কল্পনা শক্তি এবং মনন বা বিচার শক্তি সমান নয়—প্রত্যেকের জ্ঞান-অনুভব—ইচ্ছার প্রকৃতি এক নয়। এখানেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য—মানসিক শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ। জন্মগত সংস্কার অর্থাৎ দৈহিক সংস্থা এবং পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ—এই দুয়ের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপরে শক্তির মাত্রা নির্ভর করে বলেই শক্তির সাম্য কখনও সম্ভব নয়, কারণ বংশানুবৃত্তি যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন, তেমনি পরিবেশের নিয়ন্ত্রণও

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এক নয়। এই কারণেই অর্থাৎ বৃত্তির অনুশীলনের এবং বিকাশে তারতম্য ঘটে বলেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শক্তির পার্থক্য ঘটে,—ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি পৃথক হয়। বৃত্তির প্রাধান্যের ভিত্তিতে আমরা মোটামুটি দুটি শ্রেণীতে ব্যক্তিকে ভাগ করতে পারি: এক শ্রেণী—অনুভব তথা কল্পনাপ্রবণ, অন্যশ্রেণী—বিচার-প্রবণ বা মনন-প্রবণ। প্রথম শ্রেণীতে রূপ-কল্পনা প্রবণতা বেশী;—দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিচার-বিশ্লেষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা বেশী। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি শিল্পরচনায় ইচ্ছাশক্তিকে নিয়োগ করলে সহজেই সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চায় আত্মনিয়োগ করলে সহজেই সুফল লাভ করতে পারেন। তবে সোনায় সোহাগা হয় সেখানেই—যেখানে জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার সুদুর্লভ সমন্বয় ঘটে—ব্যক্তির কল্পনাবৃত্তি এবং মননবৃত্তির সমান অনুশীলন এবং বিকাশ ঘটে। সেখানে জ্ঞানের ব্যপ্তিতে ও গভীরতায়, অনুভবের অনুকল্পনশীলতায়—কল্পনার অপূর্ববস্তু নির্মাণ ক্ষমতায় এবং ইচ্ছার ঐকান্তিকতায় চিত্তে এক অনন্যসাধারণ মহত্ত্ব দেখা দেয়—যেন চিত্তের এক গুণগত পরিণাম ঘটে। এই ধরনের বিকশিতচিত্ত ব্যক্তিকেই আমরা অতি প্রতিভাবান বলে থাকি। এত শক্তিমান চিত্ত যাঁর তিনিই শ্রেষ্ঠ মহাকবি এবং তাঁর প্রতিভাই—মহাকাব্যের উপযুক্ত জনক। তাঁর জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার সংস্পর্শেই অহল্যা বিষয়বস্তু তার সমস্ত বিকাশ-সম্ভাবনা নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠে। রূপ তার পূর্ণতা নিয়েই ভাবের মধ্যে ছাড়া পায় এবং ভাব তার মহত্ত্ব নিয়ে রূপের মধ্যে অঙ্গ লাভ করে।

সাধারণ শক্তিমান কবির সঙ্গে মহাকবির পার্থক্য এখানেই যে মহাকবির কল্পনাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে থাকে বৃহৎ কিছু ধ্যান ধারণা এবং পরিকল্পনা করার শক্তি—মহীয়ানকে ধ্যান করবার এবং বৃহৎ পরিমণ্ডলে তাকে মহিমময় রূপে প্রকাশ করার ক্ষমতা। সাধারণ কবির প্রজ্ঞা যেখানে স্বল্পগ্রাহী মহাকবির প্রজ্ঞা সেখানে বহুগ্রাসী—সে বহুকিছু সমাহরণ সমীকরণ ও সংশ্লেষণ করতে পারে। অল্পশক্তির চোখে যেখানে ঘটনার সাধারণ রেখারূপটি ধরা পড়ে, মহাকবির চোখে ঘটনাবৃত্তের সমগ্র পরিমণ্ডলটি প্রতিভাত হয়। অল্পশক্তি যেখানে ভাবের নৈর্ব্যক্তিকতার অন্তরালবর্তী রূপের সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, মহাকবির চোখে সেখানে ভাবের অন্তর্নিহিত রূপ-সম্ভাবনা স্রষ্টাকারে প্রতিভাত হয়। যেখানে অল্পশক্তির হাতে 'ঘটনা' ঘটনার অধিক কিছু হতে

পারে না সেখানে মহাকবির ব্যাপক জ্ঞান, তীব্র অনুভব এবং আদর্শসেবী ইচ্ছার সংস্পর্শে ঘটনা সংস্কৃত হয়ে নবজন্ম লাভ করে—আকারে প্রকারে নতুন এবং পরাকাষ্ঠা রূপ পরিগ্রহ করে। মহাকবি মহামনা—মহাত্মা। গ্রহণে স্মরণে কল্পনায় পরিকল্পনায় সংশ্লেষণে-বিশ্লেষণে বিচারে-বিতর্কে—সব ব্যাপারেই তার মনস্বিতা অসাধারণ।

অবশ্য এই মনস্বিতার নির্বিষয় কোন রূপ সম্ভব নয়, কারণ ব্যাপার মাত্রই বিষয়সাপেক্ষ, গ্রহণ বিষয়েরই গ্রহণ, স্মরণ বিষয়েরই স্মরণ, কল্পনা বিষয়ের কল্পনা, পরিকল্পনা বিষয়েরই সুবিন্যাস—সব মানসিক ব্যাপারই বিষয়সাপেক্ষ। বিষয়-বিযুক্ত মন শূন্যমন—মনের অব্যক্ত অবস্থা; বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মন ব্যক্ত হয়—শক্তি কার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব অসাধারণ মনস্বিতা—মানসিক শক্তির আধিক্য—মহাকবি মনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বটে, কিন্তু মনস্বিতা থাকলেই মহাকবি হয়ে উঠে না। মনস্বিতার সঙ্গে মহান বিষয়বস্তুর সংযোগ ঘটলেই তবে মহাকাব্যের জন্ম হয়, মনস্বী কবি মহাকবি আখ্যা লাভ করেন। কবি-প্রতিভার গর্ভেই মহাকাব্যের ভ্রূণ পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় এ কথা সত্য বটে কিন্তু যে বীজ থেকে মহাকাব্য প্রাণীটি গড়ে উঠে সেই বীজ নিষিক্ত হয় পরিবেশের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে দার্শনিক 'সোপেনহাওয়ারের' উক্তিটি স্মরণীয়। প্রতিভার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'প্রতিভা যত বড়ই হোক নিরপেক্ষভাবে কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না—যেমন পারে না কোন স্ত্রীলোক নিজে নিজে সন্তান জন্ম দিতে। পরিবেশের দেওয়া বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংযোগ না ঘটলে প্রতিভা বন্ধ্যা হয়েই থাকে। সুতরাং একথা স্বীকার করতেই হবে যে কবির মনোভূমিতে কাব্যের জন্ম হয় বটে কিন্তু কাব্যের বীজ—বিষয়বস্তু আসে পরিবেশ থেকে অর্থাৎ সমাজ থেকে এবং মহাকাব্যের জন্ম সম্ভব হয়েছে মহামতি কবি এবং মহান ঘটনার সংযোগের ফলে। শুধু মনস্বী কবি অথবা শুধু মহান্ ঘটনা এককভাবে মহাকাব্য সৃষ্টি করতে পারে না। মহান ঘটনার অভাবে মনস্বী কবি নিষ্ক্রিয় ও নিরাশ্রয়, মনস্বী কবির অভাবে মহান ঘটনা অগম্য বা অদৃশ্য পর্বতচূড়ার মত উপেক্ষিত প্রাকৃতিক বস্তু মাত্র। যে কোন মহাকাব্যের জন্ম-রহস্য খুঁজতে গেলেই দেখা যাবে—মনস্বী কবি এবং মহান্ ঘটনা এই দুয়ের সংযোগ ঘটেছে। বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত, হোমারের ইলিয়াড, ওডিসি, কালিদাসের রঘুবংশ, ভার্জিলের এনিড, শ্রীহর্ষের

নৈষধচরিত্, মাঘের শিশুপালবধ, ভারবির কিরাতার্জুনীয়, দান্তের ডিভাইন কমেডি, ট্যাসোর জেরুজালেম লিবারেটা, মিলটনের প্যারাডাইস লষ্ট, মধুসূদনের মেঘনাদবধ প্রভৃতি মহাকাব্যের (খাঁটি মহাকাব্য এবং অলংকারশাস্ত্র সম্মত মহাকাব্য) দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাবে বড় কবি-প্রতিভার সঙ্গে মহান বিষয়ের সংযোগ ঘটার ফলেই মহাকাব্যগুলি জন্ম গ্রহণ করেছে।

ত্রেতাযুগে ভারতবর্ষে দশরথের পরিবারে বিশেষ করে দাশরথি রামের জীবনে মানবমহিমার যে প্রদীপ্ত প্রকাশ ঘটেছিল, যে সব বিস্ময়কর এবং করুণ ঘটনা ঘটেছিল, তার সমগ্র পরিমণ্ডল এবং ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিসম্পর্কের বর্ণালীকে গ্রহণ করার মতো কোন মহর্ষি বাল্মীকি না থাকলে, আর যাই হোক সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচিত হ'তো না। বাল্মীকির মতো দ্রষ্টার প্রজ্ঞালোকেই অযোধ্যা থেকে লঙ্কা পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ, তার প্রাকৃতিক ও জৈবিক প্রকৃতি নিয়ে আমাদের চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বাপর-কলির সন্ধিযুগে কুরু পাণ্ডবের পারিবারিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র ক'রে ভারতের রাজন্যমণ্ডলের মধ্যে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল মহামতি ব্যাসের সর্বার্থদশী প্রজ্ঞা ও রূপদক্ষতার সংস্পর্শেই তা' মহাভারত-মহাকাব্যে পরিণত হয়েছিল। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধকে উপলক্ষ ক'রে ব্যাসের অদ্বিতীয় মনস্বিতাই মহাভারত রূপে আত্ম প্রকাশ করেছিল। ব্যাসের মস্তিষ্কের মতো সর্বজ্ঞ মস্তিষ্ক ছাড়া মহাভারতের মতো মহাকাব্য রচিত হ'তে পারে না এবং তা' পারে না বলেই আজও মহাভারতের সমকক্ষ কোন মহাকাব্য জন্মেনি। একথা অবশ্যই বলা যায় যে চারখানি মহাকাব্য খাঁটি মহাকাব্য বলে পরিচিত, তাদের মধ্যে মহাভারত শ্রেষ্ঠ। হোমারের ইলিয়াড ও অডিসি এবং বাল্মীকির রামায়ণ মহাভারতের তুলনায় শুধু যে আয়তনেই ছোট তা' নয়, মহত্ত্বেও অনেক বড়। বাল্মীকিতে বা হোমারের আর যাই পাওয়া যাক ব্যাসের মনস্বিতা ও প্রজ্ঞা পাওয়া যায় না। কুরু-পাণ্ডবের কাহিনীকে মহাভারতে পরিণত করতে ব্যাসের মনের মতোই একটি অসাধারণ মন চাই। তেমনি গ্রীস ও ট্রয়ের মধ্যে হেলেন হরণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে মহাযুদ্ধ ঘটেছিল এবং যার ফলে ট্রয় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং গ্রীসের নানা পরিবারে নানারকম ট্র্যাজেডি ঘটেছিল সেই মহাযুদ্ধের গাথা হোমারের কবি প্রতিভার স্পর্শে—ইলিয়াড অডিসি মহাকাব্যে পরিণত হয়েছিল। কবি কালিদাস অল্পবিষয়া মতি'র দৈন্যের জন্য বিনয়

প্রকাশ করলেও, কালিদাসের মতি যে 'বহুবিষয়া' ছিল 'রঘুবংশ' মহাকাব্যই তার বড় প্রমাণ। 'রঘুবংশ' রূপ চাঁদ ধরতে হলে যে শালপ্রাংশু মহাভুজ আবশ্যক, কালিদাসের তা ছিল বলেই তিনি বামন বলে উপহাস্য হননি। বামন-প্রতিভা কখনও প্রাংশুলভ্য ফল লাভ করতে পারে না। ভার্জিলের কবি-প্রতিভার স্পর্শেই ট্রয়ের এনিয়াস ও কার্থেজের দিদোর প্রেম ও বীরত্বের কাহিনী 'এনিড' মহাকাব্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। একদিকে রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক ও মহতী প্রবৃত্তি, অন্যদিকে দিদোর প্রেম এনিয়াসের জীবনে শ্রেয়-প্রেয়ের দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বে মহতী প্রবৃত্তির জয়, দিদোর আত্ম বিসর্জন—এই উদ্দীপনাময় ঘটনা ভার্জিলের উল্লসিত কল্পনা, উচ্চকোটিক ভাবুকতা এবং সূক্ষ্মগ্রাহী অনুভূতির সহযোগে মহাকাব্যের মহিমায় উন্নীত হয়েছে। মহাকবি দান্তের কবি কল্পনার বলেই, খ্রীষ্টীয় ধর্ম শাস্ত্রানুমোদিত মানবজীবনের গতি ও পরিণতির কথা শতপর্বিক (ক্যান্টো) বিশালতা এবং জীবন মহাভাষ্যের গৌরব নিয়ে রূপকাকারে ব্যক্ত হয়েছে। এ কথা সত্য বটে যে 'his vision of Hell purgatory and paradise corresponds both to the common ideas then circulating and in many of its details, to very special doctrines classical, Moslem and even Irish"—এবং Aquinas Ibn. Arabi, Tundal এবং Virgil-এর কাছে কবি ঋণী—কিন্তু এই কথা আরো সত্য যে—"they were fused in the heat of his vision"—(A History of Western Literature by J. M. Cohen—P. 54)। সব কিছুকে আত্মসাৎ করে নতুন প্রতিভানে পরিণত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল বলেই দান্তের পক্ষে ডিভাইনা কমেডিয়া লেখা সম্ভব হয়েছিল। নৈষধচরিত, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয় প্রভৃতি মহাকাব্যও ঐ একই প্রক্রিয়ায় জন্মলাভ করেছে। মহাভারতেরই খণ্ড উপাখ্যান নলোপাখ্যান, শিশুপালবধ-কথা এবং কিরাতার্জ্জুন-যুদ্ধ কাহিনী। শ্রীহর্ষের কল্পনা, পরিকল্পনা এবং ভাবনা শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েই নলোপাখ্যান 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। ভারবির কল্পনা ও বৈদগ্ধ্য কিরাতার্জ্জুন কথাকে মহাকাব্যের মহিমা প্রদান করেছে এবং মাঘের—কবি প্রতিভা যাতে কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব, এবং শ্রীহর্ষের পদলালিত্য—এই তিন গুণেরই সমাবেশ ঘটেছে, শিশুপালবধ কথাকে

শিশুপালবধ মহাকাব্যের বিস্তার এবং মহত্ত্ব দান করেছে। 'ক্রুসেড্' বা জেরুজালেম উদ্ধার করবার জন্য খ্রীষ্টভক্তরা যে ধর্মযুদ্ধ করেছিলেন, সেই উদ্দীপক ঘটনাটি ট্যাসোর কবি-প্রতিভার স্পর্শেই 'জেরুজালেম লিবারেটা' মহাকাব্যে পরিণত হয়েছিল। এমনি ভাবেই ভাস্কো-ডা-গামার বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী 'লুই ডি ক্যামোয়েনস'-এর শক্তিশালী সৃজনী প্রতিভার সংযোগেই—'ওস্ লুসিয়াডাস' (Os Lusiadas) মহাকাব্যের (১৫৭০) পদবীতে আরোহণ করেছিল এবং বাইবেলের ক্ষুদ্র কাহিনী মিলটনের কবি প্রতিভার যাদুদণ্ড স্পর্শেই 'প্যারাডাইস লস্ট' (১৬৬৭) মহাকাব্যে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল। আমাদের বাংলা মহাকাব্যগুলি—(মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, রৈবতক, পৃথ্বীরাজ শিবাজী প্রভৃতি) সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এরা রামায়ণ মহাভারতের মত অত বড় মহাপ্রাণ সৃষ্টি না হলেও প্রত্যেকটি রচনার মূলে যে মহৎ পরিকল্পনা কাজ করেছে—বৃহৎ পটভূমিতে জীবনদ্বন্দ্বের তথা মানব মহিমার রূপ প্রকাশ করার চেষ্টা রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কার মহত্ত্ব কতখানি—মহীয়ানত্বকে কে কতখানি ধারণ করে আছে সে বিচারে প্রবেশ না করেও এ কথা বলা যায় যে মেঘনাদবধ প্রভৃতি মহাকাব্য যাঁরা সৃষ্টি করেছেন্ তাঁরা 'অল্পবিষয়া মতি' নন—সমস্যাকে—অসামান্য করে তোলার—অল্পকে বহুধা বিস্তারিত করার এবং জীবন সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উদ্ধার করার শক্তি তাদের রয়েছে। ইন্দ্রজিৎ-বধ রামায়ণের একটি উপকাহিনী। সেই ক্ষুদ্র কাহিনীটিকে সম্প্রসারিত করে মধুসূদন মহাকাব্যের বিস্তার এবং রসগাম্ভীর্য দান করেছেন। তেমনি বৃত্রসংহার অতিক্ষুদ্র পৌরাণিক কাহিনী। সেই কাহিনীটি হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমের উত্তাপে সম্প্রসারিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপক মহাকাব্যে পরিণত হ'য়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষ দেবভূমি স্বর্গ, ইংরেজ অধিকৃত ভারত ছিল দানব অধিকৃত—বৃত্রপরাজিত স্বর্গ। দেবতাদের স্বর্গোদ্ধারের সংকল্প ও সংগ্রাম ভারতকে ইংরেজ শাসনমুক্ত করারই সংকল্প ও সাধনা। নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'পলাশীর যুদ্ধে'—বাংলার তথা ভারতের পরাধীনতার সূত্রপাতের ইতিহাসকে মহাকাব্যের বিস্তৃত পটভূমিতে এবং রসসংবেদনায় ব্যক্ত করা হয়েছে। তাঁর "কুরুক্ষেত্র-প্রভাস রৈবতক"—মহাকাব্যত্রয় কবির নতুন মহাভারত গঠনের ভাবাদর্শ পরিকল্পিত নতুন

মহাভারত। মধুসূদনের মহাকাব্য ইলিয়াডেরই মতো—'প্যাথেটিক', মূলে তার কোন উচ্চভাবাদর্শের প্রেরণা নেই। হেকটরের ট্র্যাজেডির আদর্শে মেঘনাদের ট্র্যাজেডিকে রূপ দেওয়াই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন 'ভাবাদর্শকে' প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা তিনি করেননি। একের পাপে অন্যের ট্র্যাজেডি হয়—এই প্রতিপাদ্যকেও মধুসূদন সচেতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেননি। অন্যপক্ষে হেমচন্দ্রের এবং নবীনচন্দ্রের রচনার মূলে বিশেষ বিশেষ ভাবাদর্শ কাজ করেছিল যেমন অডিসিকে এ্যারিষ্টটল ব'লেছিলেন—'Ethical' আমরাও তেমনি হেমচন্দ্রের এবং নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যকে বলতে পারি—Ethical বা Ideal অর্থাৎ ভাবকেন্দ্রিক রচনা। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারে স্বদেশোদ্ধারের যে আবেগ ব্যক্ত হয়েছে, নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যে নতুন মহাভারত গঠনের যে ধ্যান (vision) রূপ পেয়েছে তার মহত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। একথাও অবশ্য স্বীকার্য বটে যে দান্তের রচনা-রীতির মতোই হেমচন্দ্রের এবং নবীনচন্দ্রের রীতি—"is not a great style in the Miltonic sense." (History of Western Literature), কিন্তু রচনা-রীতি তাঁদের কাব্যের আত্মিক মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে—এ কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না।

এখন, এই কথাই যদি সত্য হয় যে যখন মহান বিষয় এবং মহতী প্রতিভার সংযোগ ঘটে তখনই মহাকাব্য জন্ম লাভ করে, তা'হলে এ প্রশ্ন উঠবেই মহ্যকাব্যের যুগ অতীত হয়েছে, এ যুগে মহাকাব্যের জন্ম সম্ভব নয়—মহাকাব্য অতীতের এক বিশেষ যুগের সামগ্রী—এ সব কথা কি তবে সত্য নয়? বাস্তবিকই যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে—মহাকাব্য অতীতের অতিকায় জন্তুর বিলুপ্ত প্রজাতি নয়—অর্থাৎ মহাকাব্যের যুগ অতীত হয়ে যায় নি, মহাকাব্য কোন বিশেষ যুগের একচেটে সম্পত্তি নয়। অতি-প্রাচীন, প্রাচীন, অল্প-প্রাচীন এবং আধুনিক যুগ—সব যুগেই যে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে তার ইতিহাস আমাদের সামনেই আছে। তবে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য—প্রত্যেক যুগের মহাকাব্যের রূপ রস একরূপ নয়, আর অতি প্রাচীন মহাকাব্যগুলির সব কয়খানি মহাকাব্যই রূপে-রসে সমান তাও বলা চলে না। বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত যেমন আকারে প্রকারে পৃথক, তেমনি রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড অডিসি, এনিড রূপে রসে স্বতন্ত্র। আয়তনের বিশালতা আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বলে

বিশালতায় সমান হওয়া হয়ত অনেকেরই পক্ষে সম্ভব, কিন্তু রসসৃষ্টির বা জীবন সমালোচনার সামর্থ্য কবিমানসসাপেক্ষ বলে এক কাব্য থেকে অন্য কাব্য পৃথক হতে বাধ্য। হ'য়েছেও তাই। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড অডিসি, রঘুবংশ, এনিড, নৈষধচরিত, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়ম্, ডিভাইন কমেডি, রিণাল্ডো, জেরুজালেম লিবারেটা, লুসিডাস, প্যারাডাইস লস্ট, মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, পৃথ্বীরাজ, শিবাজী প্রভৃতি মহাকাব্যগুলি প্রত্যেকেই আকারে প্রকারে ভিন্ন। অর্থাৎ মহত্ত্বের মাত্রা—ব্যাপ্তি ও গভীরতার মাত্রা—সকলের সমান নয়। কারো ব্যাপ্তির তুলনায় মহত্ত্ব কম, কারো বা মহত্ত্ব বেশী, ব্যাপ্তি তত বেশী নয়। কিন্তু এক বিষয়ে সকলেরই ঐক্য আছে—সকলেই একটু অসাধারণ—সকলেই বেশী কম মহাপ্রাণ—সকলেই সামাজিক চিত্তকে তীব্রভাবে আকর্ষণ ও আলোড়িত করে। অবশ্য যেখানে তা করে না, বুঝতে হবে সেখানে রচনা রসোত্তীর্ণ হ'তে পারেনি। অর্থাৎ আকারেই বড় হয়েছে ভাবে-রসে বড় নয়। আর একটা কথাও ভেবে দেখা দরকার। মহাকাব্য বলতেই আমাদের চোখের সামনে ছন্দোবদ্ধ বিরাটাকার কাহিনী কাব্যগুলিই এসে সারি বেঁধে দাঁড়ায়, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ না হলেও, কাব্যের মহাকাব্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নেই এবং তা নেই বলেই নাটক রূপে এবং উপন্যাস রূপে বা অন্যরীতিতেও মহাকাব্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে। টমাস হার্ডির নাটক—"দি ডাইনাস্ট"কে নিঃসন্দেহে মহাকাব্যকল্প নাটক বা মহানাটক বলা যেতে পারে ; গ্যেটের "ফাউস্ট" বা বার্ণাড শ' মহাশয়ের "ব্যাক টু মেথসেলা" বা স্টিফেন ভিনসেণ্ট বেনেট "জন ব্রাউনস্ বডি" (১৮২৯) অন্যতম দৃষ্টান্ত। অবশ্য নাটক বলতে এখানে আপাতদৃশ্যধর্মী রচনার কথাই বলা হ'চ্ছে। যা অভিনেয় নয় তা নাটক নয়—এ কথাটি যে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়, সেই অর্থে নাটক শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে না। যা'হোক, তেমনি উপন্যাসেও—মেলভিল্লের "মবি ডিক" (Moby Dick)—(১৮৫১), টলস্টয়ের "ওয়ার এ্যাণ্ড পিস্" ইত্যাদি গভীর জীবন সমালোচনাপূর্ণ উপন্যাস-গুলিকে **'মহাকাব্যেরই গদ্য অবতার'** ("Prose reincarnation of epic") বলা যায়। (Living Biographies of Famous Novelists by Henry Thomas & Dana Lee. Thomas)। এমার্সনের উক্তি—

"Every great novel is a debtor to Homer" এই উক্তিটিকেই ব্যাখ্যা করে উক্ত লেখকদ্বয় লিখেছেন, "On its higher levels it is an exposition of philosophic thought presented in dramatic form. At its best it is **a prose reincarnation of the ancient epic form.**" "প্রাচীন মহাকাব্যের মতই এই জাতীয় উপন্যাস যেন জীবনের মহাভাষ্য— বিরাট পটভূমিকায় জীবনের বিশ্বরূপদর্শন—"An interpretative picture of Man. An inclusive picture of his body, his mind, his soul." জীবনের বিশ্বরূপ দর্শন পদ্যেই সম্ভব, গদ্যে সম্ভব নয়—এ কথা যদি বলা না চলে তা'হলে—গদ্য-পদ্য, শ্রব্য-দৃশ্য যে কোন রীতিতেই মহাকাব্য রচনা করা সম্ভব—সে কথাও স্বীকার করতে হয়। তারপর এ কথাও যেমন বলা চলে না যে মহাকাব্যোচিত ঘটনা সমাজ বিবর্তনের গোড়ার দিকেই ঘটে গেছে, পরবর্তী যুগে তেমন কোন ঘটনা ঘটতে পারে না, তেমনি বলা চলে না—বড় কবিপ্রতিভা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার ভার্জিলের সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ, বৃহৎ পরিকল্পনা করবার শক্তি, মহৎ ভাব-ভাবনা, উপলব্ধি করবার শক্তি ঐ কয়জন মহাকবির সঙ্গে সঙ্গেই মানব সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে। তা যদি না হয়ে থাকে—বৃহৎ ঘটনা বা শক্তিমান কবিপ্রতিভা যদি প্রাচীনতম যুগেরই একচেটে সম্পত্তি না হয়ে থাকে, তা'হলে বৃহৎ ঘটনা বা মহৎ উপলব্ধি শক্তিমান কবিপ্রতিভার সংযোগে অবশ্যই মহাকাব্যকল্প শিল্পে পরিণত হতে পারে।

কেউ কেউ মহাকাব্যের জন্য একটা **বিশেষ যুগ** চিহ্নিত করে দিতে এবং সেই যুগ-বৈশিষ্ট্যকেই "মহাকাব্যের লক্ষণ" রূপে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। এঁদেরই একদলের কথা—মহাকাব্যের যুগ অতীত হয়ে গেছে। সে যুগ ফিরে না আসলে আর মহাকাব্য জন্মাবে না।

যুগ বৈশিষ্ট্যকে যাঁরা 'মহাকাব্যের লক্ষণ' হিসাবে চালাতে চান তাঁদের মধ্যেও আবার দুটো দল দেখা যায়। একদল খাঁটি মহাকাব্য বলতে শুধু প্রাচীনতম কয়েকখানা কাব্যই ধরেছেন,—যেমন রামায়ণ, মহাভারত এবং ইলিয়াড ও অডিসি এবং দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে এই সব কাব্য রচিত হয়েছে এমন একটা যুগে যে যুগকে বলা যায় "অকৃত্রিম স্বাভাবিকতার যুগ"। সুতরাং মহাকাব্যের আসল লক্ষণ—**অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা**।

কেউ কেউ খাঁটি মহাকাব্যের তালিকা একটু বাড়িয়ে—Beowulf, Song of Roland এবং Nibelungenlied প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এই খাঁটি মহাকাব্যের নাম রেখেছেন "authentic epic" বা "epic of growth"।

এই জাতীয় খাঁটি মহাকাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত এবারক্রোম্বি মহাশয় (Lascelles Abercrombie) লিখেছেন - "poetry which seems an immediate response to some general and instant need in its surrounding community—such poetry is 'authentic' epic." অর্থাৎ খাঁটি মহাকাব্যের জন্ম হয় সমাজের সার্বজনীন এবং সাম্প্রতিক কোন ঘটনাবেগের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া থেকে। খাঁটি মহাকাব্য স্বতঃস্ফূর্ত কবির অকৃত্রিম বা সহজ প্রকাশাবেগ। এখানেই **অলঙ্কার-শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য বা "লিটারারি এপিকের"** সঙ্গে খাঁটি মহাকাব্যের মূল পার্থক্য। "লিটারারি এপিক"এর স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে পূর্বোক্তনামা লেখক লিখেছেন—"with several different kinds of poetry to choose from, a man would decide that he would like best to be an epic poet, and he would set out, in **conscious determination,** on an epic poem. The result, good or bad, of such a determination is called "literary epic" অর্থাৎ নানা ধরনের কাব্য লেখা আছে এমন অবস্থায় কবি মহাকবি হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে যখন কাব্য রচনা করেন, তখনই অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত "কাব্যিক" মহাকাব্যের জন্ম হয়। তা'হলে খাঁটি অর্থাৎ "অথেন্টিক" মহাকাব্যের সঙ্গে "লিটারারি" মহাকাব্যের আসল পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে এই যে "লিটারারি" এপিকের মূলে মহাকাব্য লেখার সঙ্কল্প বা মানসিক প্রস্তুতি থাকে, আর অথেন্টিক এপিকের মূলে তা থাকে না। অথেন্টিক এপিক পরিবেশের উদ্দীপনায় কবি চিত্তের সহজ প্রতিক্রিয়া—বড় ধরনের কোন সামাজিক আবেগের অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। খাঁটি মহাকাব্য 'অকৃত্রিম স্বাভাবিক" এই ধারণারই অন্যতম অনুসিদ্ধান্ত এবং এই অনুসিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করছে একটি বিশিষ্ট সংস্কার—"folk spirit"-এ বিশ্বাস। "Folk spirit" বলতে প্রকৃতপক্ষে এই বুঝায় যে বিশেষ এক পর্যায়ে সমস্ত সৃষ্টিই সামষ্টিক (collective) আবেগ থেকে জন্মেছে এবং তা সামগ্রিক প্রচেষ্টারই

ফল—ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। এবারক্রোম্বি মহাশয় এই ধারণাটিকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন এই—"poetry is the work of poets, not of peoples or communities; artistic creation can never be anything but the production of an individual"—(P. 27)। তিনি বলেন গাথাই (ballad) হো'ক আর মহাকাব্যই হো'ক—কোন কাব্যই যৌথভাবে রচিত হতে পারে না—"The folk origin of ballads and the multiple authorship of epics are heresies। ব্যক্তিই স্রষ্টা, সমাজ নয়। অথেন্টিক এপিক সমগ্র সমাজের রচনা আর "লিটারারি এপিক" বিশেষ কোন কবি প্রতিভার রচনা—এ কথা অশ্রদ্ধেয়। এবারক্রোম্বি মহাশয় ঠিক যে অর্থে কথাটি বলেছেন তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। তবে কেউ যদি এমন সিদ্ধান্ত করেন যে কাব্যে ব্যক্তি মাধ্যমে সামাজিক আবেগই ব্যক্ত হয় তাহ'লেও তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার থাকে না। কারণ কাব্যে মানুষ সামাজিক জীবনেরই নানা আবেগ উপলব্ধিকেই প্রকাশ করে থাকেন—একটা সামাজিক মন অন্যান্য সামাজিক মনের কাছে আপনাকে সঞ্চার করতে চায়। এই হিসাবে শিল্প-সাহিত্যকে সমগ্র গোষ্ঠীর বা জাতির সৃষ্টি বলা যেতে পারে বই কি। যা হোক অথেন্টিক 'এপিকে'র মধ্যে যে অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা বা সরলতা দেখা যায় তার কারণ এ নয় যে মহাকাব্য যৌথভাবে রচিত হয়েছে বা নানাজনের রচনা মিশে মহাকাব্য গ'ড়ে উঠেছে।

কারণ অবশ্যই আছে এবং তা আছে—যে সামাজিক পরিবেশে সেই সব কাব্যের জন্ম হয়েছে, সেই পরিবেশের প্রকৃতির মধ্যেই। মহাকাব্যের প্রকৃতি—অন্যান্য সৃষ্টির প্রকৃতির মতই—যুগবৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমাজ-নিরপেক্ষ সৃষ্টি সম্ভব নয়—"Great epic poetry will always frankly accept the social conditions within which it is composed; but the conditions contract and intensify the conduct of the poem, or allow it to dilate and absorb larger matter, according as the narrow primitive torrents of man's spirit broaden into the greater but slower volume of civilized life. The change is neither desirable

nor undesirable, it is merely inevitable. It means that epic poetry has kept up with the development of human life." (The Epic—P. 31-33). উক্তিটুকু প্রণিধানযোগ্য। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে কাব্যের রূপ রূপান্তর কার্যকারণযোগে যুক্ত এবং যুক্ত বলেই এক যুগের বা দেশের কাব্যের সঙ্গে অন্য যুগের বা দেশের কাব্যের পার্থক্য ঘটে—এ অবশ্যই লক্ষ্যণীয় সিদ্ধান্ত। 'অথেন্টিক এপিক' এর বৈশিষ্ট্য, তা' হলে যুগ-প্রকৃতির মধ্যেই খুজে দেখতে হবে এবং তা করতে গেলে দেখা যাবে—প্রথমতঃ 'অথেন্টিক এপিক' এমন এক প্রাচীন যুগে রচিত হয়েছিল যখন গান বা আবৃত্তি ছাড়া ভাব সঞ্চারণের (communication) অন্য উপায় ছিল না, অর্থাৎ, "The first epics were intended for recitations."

এই অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকার ফলেই কবিকে সামাজিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে হয়েছে—সামাজিকের গ্রহণ সামর্থ্যের মুখ চেয়ে চলতে হ'য়েছে—কবিকে এমন বিষয় রূপ দিতে হয়েছে যা গোষ্ঠীর সর্বজনের বাসনার বস্তু, এমন ভাবে রূপ দিতে হয়েছে যা সর্বজনবোধগম্য। অন্যপক্ষে, 'লিটারারি এপিকের' জন্ম উন্নততর সামাজিক অবস্থার কোলে—এবং উদ্দেশ্য শিক্ষিতপটু, বিশিষ্ট কাব্যরসিকদের চিত্তবিনোদন করা—"the literary epic is meant to be read". প্রকাশের উপায় এবং উদ্দেশ্যের পার্থক্যের ফলেই প্রকৃতিরও পার্থক্য ঘটেছে। জটিল ভাবনার, কল্পনার এবং ভাবের অবসর দেখা দিয়েছে। এই ভাবে পার্থক্য দেখানো কতখানি যুক্তিসহ ব্যাপার, তা অবশ্য বিচার করে দেখা দরকার। রামায়ণ মহাভারত নিশ্চয়ই খাঁটি মহাকাব্য, কিন্তু রামায়ণ যেরূপ 'meant for recitations', মহাভারত সম্পূর্ণ সেরূপ নয়। জটিল ভাবনা-কল্পনা মহাভারতে যেমনটি আছে পরবর্তী অনেক অলঙ্কারসম্মত মহাকাব্যে তেমনটি নেই। মহাভারতকে অনেকটা 'meant to be read' বলা যেতে পারে। অবশ্য 'রঘুবংশ' 'নৈষধচরিত' 'শিশুপালবধ' প্রভৃতি মহাকাব্য যতটা 'meant to be read'—অর্থাৎ পাঠের উদ্দেশ্যেই রচিত,—মহাভারত ততটা নয়। তবু মহাভারতকে 'অথেন্টিক এপিক' বলতেই হবে। কিন্তু তা' ব'লতে গেলে পূর্বোক্ত লক্ষণটিকে যথাযথভাবে গ্রহণ করা চলে কি ?

অথেন্টিক এবং লিটারারি এপিকের আলোচনা এই পর্যন্তই যথেষ্ট। এবার আলোচনার মূল ক্ষেত্রে ফিরে আসা যাক। মহাকাব্যের জন্য বিশেষ যুগ অপেক্ষিত কি না—এই প্রশ্নের সমালোচনার কথা বলছি। একদল যেমন বলেছেন—**অকৃত্রিম স্বাভাবিকতার** যুগেই মহাকাব্যের জন্ম সম্ভব তেমনি আর একদল (এবারক্রোম্বি প্রমুখ) বলতে চেয়েছেন—মহাকাব্যের জন্মের জন্য চাই সমাজের বিশেষ একটি অবস্থা। সেইরূপ বিশেষ অবস্থা যখনই এসেছে মহাকাব্যের সম্ভাবনা তখনই দেখা দিয়েছে এবং সে অবস্থা এসেছে একাধিকবার আর মহাকাব্যও রচিত হয়েছে অনেকবার। এই বিশেষ সামাজিক অবস্থাকে এককথায় বলা যায়—"হিরোয়িক এজ" (Heroic Age)।

এই কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এবারক্রোম্বি লিখেছেন—"The note of the Heroic Age, then, is vehement private individuality freely and greatly asserting itself." অর্থাৎ, প্রবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সেই বোধের প্রেরণায় দুর্বার আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রয়াস—"হিরোয়িক এজ" এর লক্ষণ। বর্বর যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গোষ্ঠী-চেতনার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে, ফলে—"Vigorous expression of private individuality"—সে স্তরে সম্ভব হয় না। আবার সভ্যযুগে (state of civilization) প্রবল সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রবল ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটে বলে ঐরূপ ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের অবকাশ থাকে না। "হিরোয়িক এজ"-এর একদিকে বর্বর-যুগ (savagery) অন্যদিকে—সভ্যযুগ (state of civilization) মাঝখানে—"হিরোয়িক এজ"—ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দুর্বার আবেগের যুগ। সভ্যযুগের নীতির ভিত্তি যেখানে ব্যক্তি-স্বার্থ ও সমাজস্বার্থের সামঞ্জস্য, "হিরোয়িকএজ"—এর নীতির ভিত্তি সেখানে ব্যক্তিস্বার্থ—ব্যক্তিত্বের অবাধ-মুক্তি। এই "হিরোয়িক-এজ"-এর বুকেই মহাকাব্যের জন্ম। অবশ্য "হিরোয়িক-এজ"-এর উপস্থিতি মাত্রই মহাকাব্যের উৎপত্তি হয় তা নয়—মহাকাব্যের জন্য মহাকবির আবির্ভাবও অত্যাবশ্যক। "Heroic Age must be capable of producing individuality of much profounder nature than any of its fighting champions or rather, we should simply say that the Production of Epic Poetry depends on the

Occurrence (always an accidental occurrence) of creative genius"—(P. 19)

এবারক্রোম্বি মহাশয়ের এই যুগ বিভাগ পরিকল্পনা—((ক) বর্বর-যুগ→ (খ) বীর-যুগ→(গ) সভ্য-যুগ)—সম্পূর্ণ ইতিহাসসম্মত—এ কথা যেমনি বলা চলে না—তেমনি 'অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা'র যুগটিও অনেকটা কাল্পনিক। রামায়ণ, মহাভারত বা ইলিয়ড অডিসি 'অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা'ময় এবং যে যুগে তারা রচিত হয়েছে তাও 'অকৃত্রিম স্বাভাবিকতার' যুগ—এ কথা প্রমাণ করতে গেলে অনেক প্রমাণ অগ্রাহ্য করেই করতে হবে। মানুষের সমাজে কৃত্রিম অকৃত্রিম হাত ধরাধরি করেই চ'লে আসছে। সুতরাং বিশুদ্ধ অকৃত্রিম এবং বিশুদ্ধ কৃত্রিম—কাল্পনিক সমাজে ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না। পশুর আচরণেই যেখানে অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা পাওয়া যায় না—সেখানে উন্নত মস্তিষ্ক মানুষের আচরণে সার্বজনীন অকৃত্রিমতা আশা করা চলে কি? বলা বাহুল্য, রামায়ণ মহাভারতের, ইলিয়ড অডিসির পাত্র পাত্রীর আচরণ যে সবটাই অকৃত্রিম স্বাভাবিক তা বলা চলে না।

শ্রীযুক্ত এবারক্রোম্বি মহাশয়ের "হিরোয়িক এজ" সম্পর্কিত আলোচনা আর যা করুক, প্রচলিত সভ্য-যুগের ধারণা থেকে 'হিরোয়িক এজ'কে সম্পূর্ণ পৃথক করতে পারেনি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ, ব্যক্তির প্রবল আত্মপ্রতিষ্ঠা-বাসনা, স্বার্থপরায়ণতাকে শুধু "হিরোয়িক এজ"-এরই লক্ষণ বলে নির্দেশ করলে একদেশদর্শিতা হবে। এ কথা স্বীকার্য যে বর্বর-যুগে অর্থাৎ আহরণ পর্বে বা শিকার-পর্বে, সমাজ জনসংখ্যার বা বস্তুসমৃদ্ধির দিক দিয়ে খুবই অনগ্রসর, ফলে মহাকাব্যোচিত ঘটনা ঘটার অবকাশ সেখানে নেই, তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সংঘর্ষ সব অবস্থাতেই ঘটা সম্ভব, এই বর্বর যুগে—"Each person is the tribe in little" এবং "He thinks, he feels, he lives, all in a whole"—(P. 9) বটে, কিন্তু, তাই বলে যে সেখানে **গোষ্ঠীগত** বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকতে পারেনা—এ কথা বলা যায় না। আর বর্বর যুগের ভাঙন ঘটার কারণ যা' যা' এবারক্রোম্বি নির্দেশ করেছেন—তা'ও খুব বিচারসহ মনে করা যায় না। বিরোধী বিজাতীয় জাতির সঙ্গে সংঘাত ও সংমিশ্রণ, অথবা আহার্যের অভাবের তাড়নায় দেশত্যাগ করা এবং ভিন্ন দেশ জয় করে সেখানে বসতি স্থাপন করা—

অন্যতম নিমিত্ত কারণ হতে পারে বটে, কিন্তু কারণের সবটা নয়। আদিম সাম্যাবস্থার মধ্যে বৈষম্যের উৎপত্তি ঘটেছে যে মূল কারণে সেই মূলকারণ অর্থ নৈতিক ; সামাজিক বৈষম্যের সুড়ঙ্গ পথেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য,—আত্ম-প্রতিষ্ঠার রাজসিংহাসন টেনে নিয়ে এসেছে। সমাজ বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে—ব্যক্তি স্বার্থের অবাধ সিদ্ধিলাভ উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থার উপর আধিপত্য যে যত বেশী পেয়েছে, তার পক্ষেই তত বেশী করা সম্ভব হয়েছে। সর্দারতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, পুঁজিবাদীতন্ত্র—এই সব তন্ত্রের আমলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রশ্রয়, ব্যক্তি-স্বার্থের প্রশ্রয় খুবই বেশী হয়েছে "Vigorous expression of private individuality," শুধু তথাকথিত হিরোয়িক-যুগেই সম্ভব, সভ্যযুগে—ঐতিহাসিক অর্থের সভ্যযুগে—সম্ভব হয় না, এ কথা মানা যায় বলে মনে হয় না। তা'হলে বলতে হবে :—যেখানে ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের কোন বিরোধ নেই—যেখানে ব্যক্তি সমাজ স্বার্থের সঙ্গে আপনার স্বার্থ এক করে দিয়েছে বলে বিদ্রোহ-বিপ্লবের কোন অবকাশ নেই, সেই সভ্যযুগ আসতে এখনও বিলম্ব আছে। এবারক্রোম্বি মহাশয়ের 'সভ্যযুগ' 'হিরোয়িক' যুগের মতই একটা নৈর্ব্যক্তিক ধারণা বলে মনে হয়। সভ্যযুগ যেন সমাজের নির্দ্বন্দ্ব শান্ত অবস্থার পর্যায়টুকু। এই অবস্থা যখন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রয়াস ও বিদ্রোহ-বিপ্লব দ্বারা ব্যাহত হয়—সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে ব্যক্তির শৌর্য-বীর্যের দীপ্ত প্রকাশ ঘটে, তখনকার দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ যুগটিকে বলা যায় 'হিরোয়িক এজ',—এই ভাবে দেখলে, সভ্যযুগ এবং 'হিরোয়িক'-যুগ, সমাজের আবর্তনে যেন দুটো ঋতু। সভ্যযুগ যেন স্থিতির যুগ (thesis)—'হিরোয়িক' প্রতি-স্থিতির (antithesis) যুগ—এদের সংস্থিতি (synthesis) ঘটে নতুন সভ্য-যুগে। এবারক্রোম্বি মহাশয়ের ধারণাকে এই ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বলা যেতে পারে—**বর্বর যুগ** প্রথম **স্থিতির যুগ** প্রথম হিরোয়িক যুগ প্রথম 'প্রতিস্থিতি'র যুগ এবং সভ্যযুগ প্রথম 'সংস্থিতি'র যুগ। তারপরে হিরোয়িক এবং সভ্য-যুগের মধ্যে, স্থিতি—প্রতিস্থিতি—সংস্থিতির দ্বান্দ্বিক গতির পালা চলে আসছে। তবে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে এবারক্রোম্বি মহাশয় এই সব 'স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির' বা দ্বান্দ্বিক গতির কথা বলেছেন। আগেই বলা হ'য়েছে তাঁর ধারণাকে নতুন ভাবে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

তবে এবারক্রোম্বি মহাশয়ের আলোচনা থেকে যে সত্যটা আমরা উদ্ধার করতে এবং কাজে লাগাতে পারি তা' এই যে সমাজ গতিশীল, সেখানে জাতির সঙ্গে জাতির দ্বন্দ্ব ঘটে আবার সমন্বয়ও ঘটে, দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের সময় সমগ্র সমাজে অর্থাৎ সমাজের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, উদ্দীপনা জাগ্রত হয় তথা-ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে, ব্যক্তির দেহ-মনের শক্তি সম্ভাবনা পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। জাতি দ্বন্দ্ব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমরা শ্রেণী দ্বন্দ্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে পারি—সমাজের গতি জাতিদ্বন্দ্বের দ্বারা প্রভাবিত হয় এ কথা সত্য বটে কিন্তু শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রভাবই বরং বড় প্রভাব। জাতিদ্বন্দ্বের সময় যেমন সমগ্র সমাজ জাতিচেতনায় একক ব্যক্তি-সত্তার মতো উদ্দীপিত হয়—আত্মরক্ষায়, আত্মপ্রতিষ্ঠায়, এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি তীব্র শ্রেণী দ্বন্দ্বের সময়েও সংক্ষোভ সৃষ্টি হয়—যুযুধান দুই শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীচেতনা উদ্দীপিত হয়—ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শৌর্যবীর্য বিস্ফুরিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। সমাজ চিত্তের বিক্ষোভের অবস্থাকে সাধারণভাবে 'হিরোয়িক' আখ্যা দিলে, হিরোয়িক যুগে মহাকাব্যের জন্ম হয়, মোটামুটিভাবে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে—মহাকাব্যের উপযোগী বৃহৎ ঘটনা ঘটতে পারে উন্নত পর্যায়ে সমাজ এগিয়ে এলেই, অর্থাৎ—আদিম অবস্থা থেকে উন্নত বাস্তব ও মানস সংস্কৃতিতে সমাজ অনেকটা এগিয়ে না এলে মহাকাব্যের উপাদান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে বাস্তব বা মানস সংস্কৃতি এগিয়ে এলে মহাকাব্য রচিত হবেই এমন কথা বলা হচ্ছে না। মহাকাব্যের উপাদানের জন্য চাই—পূর্বোক্ত হিরোয়িক যুগ এবং রচনার জন্য চাই বড় কবি প্রতিভা।

ভারতবর্ষের আদি মহাকাব্য 'রামায়ণ' যে উপাদানে গঠিত হয়েছে, সে উপাদান আদিম স্তরের সমাজ ক্ষেত্রে জন্মেনি। আহরণ, শিকার যুগ পার হয়ে সমাজ তখন কৃষিযুগে—শিল্পযুগে এসে দাঁড়িয়েছে—রাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন এক বিশেষ পর্যায়ের উন্নত সমাজের বুকে রাম রাবণের যুদ্ধ ঘটেছিল। রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত—অযোধ্যা এবং লঙ্কা দুই দেশেই এবং দুই রাজারই রাজ্য চতুর্দিকে বেশ সম্প্রসারিত। রাবণের প্রভুত্ব বা সাম্রাজ্য জনস্থান পর্যন্ত প্রসারিত; খর দূষণ সেখানকার প্রতিনিধি বা উপরাজ। বস্তু ও মানস সংস্কৃতিতেও দুই দেশ বেশ উন্নত। রাম রাবণের

যুদ্ধ তাই আদিম গোষ্ঠীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মাত্র নয়। আরো বড় ঘটনা। অবশ্য রাম-রাবণের যুদ্ধ রামায়ণের খুব বড় ঘটনা বটে, কিন্তু রামায়ণের প্রধান ঘটনা নয়। রামায়ণের প্রধান ঘটনা পারিবারিক দ্বন্দ্ব এবং রঘুবংশের সঙ্গে রক্ষোবংশের যুদ্ধ নয়, প্রধান ঘটনা—যুদ্ধ বটে, কিন্তু আরো বড় যুদ্ধ—প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির যুদ্ধ এবং নিবৃত্তির জয়—সমাজ-ধর্ম (General will) বনাম ব্যক্তিধর্মের (Individual will) যুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত সমাজধর্মের বিজয় ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে' সমাজ স্বার্থের স্থাপন। এই দিক থেকে দেখলে—রামায়ণকে যথার্থ বাধাবন্ধহীন "Vigorous expression of private individuality—" যুগের সৃষ্টি বলা চলে না; বরং এই কথাই বলতে হয় যে, মহাকাব্যখানির নায়কাদি অধিকমাত্রায় সমাজধর্ম তথা নীতিধর্ম প্রভাবিত। এঁদের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি তা' স্বার্থপরায়ণ নয়, সমাজার্থপরায়ণ। সমাজ নীতি বা ধর্মের আবেগ দিয়েই এঁদের ব্যক্তিত্বের বনিয়াদ গঠিত। ব্যক্তিরূপে এরা যেন সমাজসত্তারই বলবান বিগ্রহ। সুতরাং বাধাবন্ধহীন বেপরোয়া ব্যক্তিত্ব বোঝাতে 'Vigorous expression of private Individuals" কথাটা ব্যবহার করলে—রামায়ণ, মহাভারত সম্পর্কে এবং অন্যান্য মহাকাব্য সম্পর্কেও সম্পূর্ণ কথাটা খাটে না। প্রতিপক্ষের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থের প্রাবল্য ছিল বটে কিন্তু তাদের মধ্যেও 'racialism' এর আবেগ কম প্রবল ছিল না। মোট কথা, রামায়ণ পূর্বোক্ত হিরোয়িক-যুগ-লক্ষণান্বিত কোন যুগের সৃষ্টি এ কথা জোর করে বলা যায় না। রামের জীবনে ব্যক্তি-স্বার্থের প্রশ্রয় নেই, আছে সমাজ-স্বার্থের প্রতি প্রগাঢ় পরমানুরাগ। এই পরমানুরাগের মধ্যেই রামের মহত্ত্ব পরিস্ফুরিত হয়েছে। রাম যত বড় শস্ত্রবীর, তার চেয়ে অনেক বড়—আদর্শবীর বা নীতিবীর। নৈতিক বীর্যের মহত্ত্বের মধ্যেই রামায়ণের প্রকৃত মহত্ত্ব রয়েছে। এই নীতি-নিষ্ঠার ঐকান্তিকতাকে "Vigorous expression of private individuality" বললে অবশ্য ভিন্ন কথা। রামের মধ্যে বা দশরথের মধ্যে 'individuality' থাকলেও (যা কমবেশী সব যুগেই সম্ভব) 'individualism' নেই। আগেই বলা হয়েছে—আছে সমাজ-স্বার্থপরায়ণতা, বংশমর্যাদা অনুরক্তি (Racialism বা Socialism).

মহাভারতেও এই নৈতিক বীর্যের মহিমাই প্রদর্শিত হয়েছে। অধর্মের কালো পটে ধর্মের উজ্জ্বল দীপ্তশিখা আঁকা হয়েছে। বাধাবন্ধনহীন প্রবৃত্তির

জয়গান করবার উদ্দেশ্যে মহাভারত লেখা হয়নি, ধর্ম সংস্থাপনের জন্যই ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয় দেখাবার জন্যই লেখা হয়েছিল। কুরু-পাণ্ডবের গৃহ বিবাদ কেমন করে ভারতবর্ষব্যাপী—(জাতিদ্বন্দ্বের ?) মহাসমরে পরিণত হয়েছিল শুধু তারই বিবরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহাভারত লিখিত হয়নি। পাণ্ডবের ধর্মনিষ্ঠার, বিশেষতঃ ধর্মবীর যুধিষ্ঠিরের নৈতিক বীর্য ও নিবৃত্তির মহাশক্তিকে, নরনারায়ণের মহিমাকে বড়ো করে দেখানোর জন্যই মহাভারত লিখিত হয়েছে। রামের মতোই পাণ্ডবরা শুধু বড় রিপুজিৎই নন, পাণ্ডবরা ষড়রিপুজিৎ। মূলতঃ এই নৈতিক বীরত্বেরই (হিরোয়িজমের) কাব্য রামায়ণ ও মহাভারত।

রামায়ণ-মহাভারতে যে মূল দ্বন্দ্ব ব্যক্ত করা হয়েছে তাকে এককথায় বলা যায় "নৈতিক" (Ethical)। সমাজে ব্যক্তি বড় নয়—বড় সমাজধর্ম। সমাজধর্ম রক্ষাতেই ব্যক্তির পূর্ণ মহত্ত্ব। এই নীতিই রামায়ণ মহাভারতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যে দ্বন্দ্বের সাহায্যে করা হয়েছে তার এক পক্ষে রাম, প্রতিপক্ষে রাবণ ; এক পক্ষে পাণ্ডব প্রতিপক্ষে কৌরব। অবশ্য ব্যক্তিত্বে পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ উভয়ই শক্তিমান এবং সেই হিসেবে 'হিরোয়িক' নিঃসন্দেহ, কিন্তু এ 'হিরোয়িক' ব্যক্তিত্ব সব যুগেই সম্ভব।

হোমারের ইলিয়ড অডিসি লেখা হয়েছে অনুরূপ রাজতান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পরে। রাজা এগামেমনন শুধু রাজাই নন— রাজচক্রবর্তী। এহেন রাজচক্রবর্তীর বংশমর্যাদা অর্থাৎ ভ্রাতৃবধূ, মেনেলাসের পত্নী হেলেনের অপহরণ উপলক্ষ্য করে, গ্রীক সম্রাট এবং ট্রয় সম্রাটের মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল সেই যুদ্ধের কাহিনীকেই হোমার ২৪টি সর্গে বর্ণনা করেছেন। "অডিসি"—মহাকাব্যেও—২৪টি সর্গে ট্রয় যুদ্ধের পরবর্তী অন্যতম ঘটনা—"অডিসি'র কাহিনী—প্রত্যাবর্তন কালে অডিসির বন্দীদশা পরে মুক্তি বর্ণনা করেছেন। ইলিয়ড—অডিসিতে যে সব পাত্র পাত্রী আছেন তারা শক্তিধর বটে কিন্তু তাদের মধ্যেও যেমন আছে ব্যক্তিস্বার্থবোধের কেন্দ্রানুগতা, তেমনি আছে জাতিচেতনার কেন্দ্রাতিক প্রেরণা। গোষ্ঠী-চেতনার প্রেরণা বলেই তো সকলে এগামেমননের অধীনে যুদ্ধ করতে এসেছেন। 'Vigorous expression of private individuality" অপেক্ষা বংশাভিমান, গোষ্ঠী চেতনাই এখানে প্রবল। যা' হোক মহাকাব্য শুধু—অকৃত্রিম স্বাভাবিকতার যুগে

বা হিরোয়িক যুগেই সৃষ্ট হ'তে পারে—এই সিদ্ধান্ত স্বীকার না করে, আমরা যদি এই কথাই বলি যে যে-কোন যুগেই মহৎ ঘটনার সঙ্গে মহান্ কবি মানসের সঙ্কল্প ও সৃজনী প্রতিভা যুক্ত হলে মহাকাব্য জন্মাতে পারে, তা হলে প্রশ্ন উঠবে —আধুনিক কালে মহাকাব্য জন্মাচ্ছে না কেন? আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চার রকম উত্তর সম্ভব:—(১) তেমন মহৎ ঘটনা ঘটছে না, (২) ঘটনা ঘটলেও বড় প্রতিভাবান কবির অভাব (৩) মহৎ ঘটনাও ঘটেছে, বড় প্রতিভাবান কবিও আছেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনার তাগিদ বা সঙ্কল্প নেই। (৪) মহাকাব্য জন্মাচ্ছে—তবে তাদের রূপ-রস আগের পদ্য মহাকাব্যগুলি থেকে পৃথক। বাস্তবিক, মহাকাব্যসুলভ মহান ঘটনা ঘটছে না—বা তেমন বড় কবি প্রতিভা জন্মাচ্ছে না—এ কথা স্বীকার করা চলে না। এই পর্যন্ত মানা যেতে পারে যে মহাকাব্য রচনার তাগিদ নেই—সঙ্কল্পও নেই। মহাযুদ্ধগুলি নিয়ে, রাষ্ট্র বিপ্লব নিয়ে, বস্তুবাদ অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্ব নিয়ে, মহাকাব্য রচনা করা না যেতে পারে এমন নয়, কিন্তু তেমন কোন মহাকাব্য যে লেখা হয়নি এ কথা স্বীকার করতে হবে। তবে কি এ যুগের পাঠক "মহাকাব্য" পড়তে চায় না? তা'ই বা কি করে বলা যায়? অনেক বড় বড় গ্রন্থ সে তো পড়ছে? কত বড় বড় উপন্যাস পড়ছে সুতরাং পড়তে চায় না, এ যুক্তি অপেক্ষা মহাকবিদের "সঙ্কল্প" নেই—এই যুক্তিই উপযুক্ত মনে হয়। আধুনিক কালের কবিদের সঙ্কল্প নিয়ন্ত্রিত হয় প্রকাশকের চাহিদা দ্বারা, তাই তাঁদের কাছে মহাকাব্য রচনা করতে যাওয়া আর সময় নষ্ট করা একই কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে যদি বলা যায় মহাকাব্য তার পদ্যরূপ ত্যাগ করেছে বটে কিন্তু গদ্যরূপ ধারণ করে আজও বর্তমান, তা'হলে একটা মীমাংসায় পৌঁছানো যেতে পারে। মহাকাব্যোচিত ঘটনা বা ভাবকে সমুচিত চিন্তার এবং গাম্ভীর্যের সঙ্গে যেখানে প্রকাশ করা হয়—প্রকাশরীতি সেখানে যেমনই হো'ক মহাকাব্যই সৃষ্টি করা হয়। এই অর্থে মহান ঘটনা বা সার্বজনীন জীবনরহস্য যাদের বিষয় এমন অনেক বড় বড় উপন্যাস বা নাটককে "মহাকাব্য" বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্তের অভাব নেই, আগেই তা' বলা হয়েছে।

॥ ৩ ॥

মহাকাব্যের লক্ষণ

প্রতীচ্যের প্রাচীনতম সাহিত্য-শিল্প শাস্ত্র এ্যারিষ্টটলের "পোয়েটিকস্"। এই গ্রন্থে নাটকের আলোচনা, বিশেষতঃ ট্র্যাজেডির আলোচনা অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে বটে, কিন্তু কমেডি, মহাকাব্য এবং সমালোচনা সমস্যা, সম্পর্কেও আলোচনা আছে। সে আলোচনাকে যথেষ্ট না বলা গেলেও উল্লেখযোগ্য বলতেই হবে। মহাকাব্য সম্পর্কে এ্যারিষ্টটলের প্রথম বক্তব্য এই যে মহাকাব্য অন্যতম "সিরিয়াস" ইমিটেশন্ বা অনুকরণ—(গ্রীক শব্দ—"মাইমেসিস্")। কবিদের মধ্যে যাঁরা গুরুচিত্ত (graver spirit) তাঁরা গীতিকবিতার সুরে রচনা করেছেন —দেবস্তুতি বা রাজস্তুতি, কথাকাব্যের সুরে—'মহাকাব্য' এবং দৃশ্যকাব্যের সুরে—ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য সমগোত্রীয় সৃষ্টি, উভয়েরই সংকল্প জীবনের গুরুগম্ভীর ও তীব্র দ্বন্দ্ব-সংকটের রূপ প্রকাশ করা। অর্থাৎ প্রধান রসের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—"Epic poetry must have as many kinds as Tragedy, it must be simple or complex or ethical or 'pathetic'। 'Simple' এবং 'Complex' গঠন বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রযোজ্য। যে রচনায় ঘটনাগুলি একের পর এক পারম্পর্য অনুসারে বিন্যাস করা হয়—'বিপর্যাস' (Reversal of situation) এবং প্রত্যভিজ্ঞান (Recognition) ব্যাপার থাকে না, তাকে বলা হয়—'সরল' (Simple) গঠন। আর যাতে—পরিস্থিতি-বিপর্যাস বা প্রত্যভিজ্ঞান ব্যাপার থাকে বা উভয়ই থাকে এবং যাতে প্রত্যেক পরবর্তী ঘটনা, পূর্ববর্তী ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেখা দেয়, তাকে বলে জটিল (complex) গঠন। গঠন সম্পর্কিত আলোচনা আপাতত স্থগিত থাক। রসের বৈশিষ্ট্য নিরূপণই এখনকার মুখ্য আলোচ্য। ট্র্যাজেডিকে রসের ভিত্তিতে এ্যারিষ্টটল দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এক "প্যাথেটিক" দুই "এথিকাল"। "প্যাথেটিক"—ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য—"passion" সৃষ্টি করা (where the motive is passion) এবং "এথিকাল" ট্র্যাজেডির—"motives are ethical"। এ্যারিষ্টটলের মতে—হোমারের ইলিয়াড "সরল" বৃত্ত এবং করুণরসাত্মক অর্থাৎ

রস-মুখ্য এবং অডিসি জটিলবৃত্ত এবং 'এথিকাল'—অর্থাৎ নীতি-মুখ্য রচনা। ট্র্যাজেডির রস সম্পর্কে এরিস্টটলের সাধারণ ধারণা এই যে—ট্র্যাজেডিতে **ভয়ানক ও করুণ রসোদ্দীপক** ঘটনার উপস্থাপনা থাকা চাই। It should imitate actions which excite pity and fear, this being the distinctive mark of tragic imitation (45). ট্র্যাজেডিতে আমরা সেই সকল জীবনেরই রূপ দেখতে পাই "who have done or suffered something terrible" এই দিক দিয়ে দেখলে, দুই জাতের ট্র্যাজেডি সম্ভব, এক—ভীষণ কিছু করার ট্র্যাজেডি, দুই—ভীষণ দুঃখদুর্দশা-ভোগ করার ট্র্যাজেডি। 'ইলিয়াডে' একপক্ষে একিলিসের ক্রোধ অর্থাৎ ভীষণ নিষ্ঠুর কার্যের কথা অন্যদিকে ট্রয়ের শোচনীয় দুঃখদুর্গতির কথা বর্ণিত হয়েছে। 'অডিসি'তে অডিসির অশেষ দুর্গতির এবং অন্তে মুক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, বিশেষতঃ বর্ণিত হয়েছে পেনিলোপের পাতিব্রত্য। ইলিয়াড বিয়োগান্ত করুণরসাত্মক মহাকাব্য—অডিসি মিলনান্ত মহাকাব্য। (ট্র্যাজেডিরও মিলনান্ত হতে বাধা নেই)। মূল রসে ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকলেও, মহাকাব্যে ঘটনাবাহুল্য এবং রসবৈচিত্র্য অনেক বেশী থাকে ব'লে "grandeur of effect'ও বেশী হয়। এরিস্টটল স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন —"Epic poetry differs from Tragedy in the scale on which it is constructed, and in is metre (৯১ পৃঃ)। ট্র্যাজেডি অভিনয়-মুখাপেক্ষী ব'লে "presented at a single sitting" বলে নির্দিষ্ট কাল মাত্রার মধ্যে আবদ্ধ। তারপর একই সময়ে ঘটিত একাধিক ঘটনাকে ট্র্যাজেডি রূপ দিতে পারে না—মঞ্চে যেটুকু দৃশ্য করা সম্ভব সেইটুকুর মধ্যেই তাকেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। অন্যপক্ষে, শ্রব্যকাব্য ব'লে মহাকাব্যের আয়তন বৃদ্ধির বিশেষ ক্ষমতা আছে (a great—a special—capacity for enlarging its dimensions". ট্র্যাজেডির ক্ষমতা যেখানে সীমাবদ্ধ মহাকাব্যের ক্ষমতা সেখানে অসীম। প্রাসঙ্গিক বহু ঘটনা বা কাহিনীকে মহাকাব্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে,—যুগপৎ-ঘটিত বহু ঘটনাকে উপস্থাপিত করতে পারে, এরই ফলে মহাকাব্যের কলেবর ও গৌরব বৃদ্ধি পায়—ঘটনাবাহুল্য শুধু রস-বৈচিত্র্যই সৃষ্টি করে তা নয়, বিরাটের বোধকে—আকৃতিগত মহত্ত্বকে জাগিয়ে তোলে "add mass and dignity to the poem"। এই আয়তন-

গত মহত্ত্ব তথা চমৎকারিত্বকে মহাকাব্যের বৈশেষিক লক্ষণ (differentia) বলা যেতে পারে। মোটকথা এরিস্টটল-মতে মহাকাব্যের রস গুরুত্বে যেমন গভীর হওয়া চাই, তেমনি থাকা চাই তার আয়তনের বিরাটত্ব। অর্থাৎ আয়তন আছে রসগাম্ভীর্য নেই বা রসগাম্ভীর্য আছে আয়তন নেই,—সেরূপ স্থলে মহাকাব্যের মর্য্যাদা থাকে না। মহাকাব্যের রসে ও ঘটনার বিস্ময়কর ঐশ্বর্য থাকা চাই। ঐশ্বর্যের কারণ অবশ্যই উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে আরও একটু বলবার আছে। শ্রব্য কাব্য হওয়ার ফলে মহাকাব্য শুধু যে যুগপৎ ঘটিত ঘটনাকেই রূপ দিতে পারে তা' নয়—এমন সব ঘটনা বা বিষয় রূপ দিতে পারে যা নাটকের পক্ষে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না আর সম্ভব হ'লেও তার গাম্ভীর্য বজায় রাখা যায় না। যেমন, যুদ্ধের ব্যাপার, বর্ণনায় যত গুরুগম্ভীর-ভাবে রূপ দেওয়া যায়, রঙ্গমঞ্চে সেভাবে দেওয়া যায় না। পশ্চাদ্ধাবনাদি ব্যাপারও রঙ্গমঞ্চে হাস্যোদ্দীপক হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশী। এই কারণেই মহাকাব্যে বর্ণনাদির দ্বারা অধিক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার অবতারণা করা যায় এবং তা' যায় বলেই মহাকাব্যে—"element of wonder" মেশানোর অবকাশ বেশী। 'শ্রব্য' বলেই—মহাকাব্য এই সুযোগের অধিকারী; আয়তনের মহত্ত্ব, ঘটনাবাহুল্য, রসবৈচিত্র্য, অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ—এই সমস্ত কিছুর সম্ভাবনাই "শ্রব্য" লক্ষণের মধ্যেই নিহিত

মহাকাব্যের রস সম্পর্কে এরিস্টটল যা' বলতে চেয়েছেন তা' বিশ্লেষণ করে মোটামুটি এমন একটা সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে—মহাকাব্যের অঙ্গীরসে এবং ট্র্যাজেডির অঙ্গীরসে কোন পার্থক্য নেই তবে মহাকাব্যে অদ্ভুতরসের মাত্রা ট্র্যাজেডি অপেক্ষা বেশী। অঙ্গীরস ভয়ানক—মিশ্র করুণ বা "ভাব"—রস (ethical) যাই হোক না কেন, মহাকাব্যে ভূমারস (বিরাটের চেতনা বা ভাবের উদ্দীপনার ফলে এই ভূমারস জন্মে) এবং বড় "scale বা dimension" থাকা চাই। এই হিসাবে 'ভূমারস'কে মহাকাব্যের বিলক্ষণ 'রস' বলা যেতে পারে।

মহাকাব্যের গঠন সম্পর্কে এরিস্টটলের বক্তব্য এই যে—(ক) মহাকাব্যের গঠন সরল (simple) অথবা জটিল (complex) হতে পারে। (খ) ট্র্যাজেডির মতোই মহাকাব্য—"should have for its subject a single action, whole and complete, with a beginning, a middle and an end.

It will thus resemble a living organism in all its unity…।" অর্থাৎ 'কার্য—ঐক্য' (unity of action) মহাকাব্যেও থাকা চাই। তাঁর ধারণা এই ঐক্য যত শিথিল হয় তত রচনায় ইতিহাসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাব্যের উদ্দেশ্য যেখানে—একক কার্যকে উপস্থাপিত করা, ইতিহাসের উদ্দেশ্য সেখানে—গোটা একটা যুগকে এবং সেই যুগের মধ্যে একের বা বহুর জীবনে যত ঘটনা ঘটেছে তাদের বর্ণনা করা। তবে 'কার্য—ঐক্য' বলতে যথার্থ যা বুঝায় তা' সব কবি বজায় রাখেন নি সে কথাও এরিস্টটল জানিয়েছেন। হোমার ছাড়া আর যাঁরা মহাকাব্য রচনা করেছেন "Cypria" বা "little Iliad" এর রচয়িতা, তাঁরা একক একটি কার্যকে রূপ না দিয়ে—"a single hero, a single period or an action single indeed but with a multiplicity of parts" রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই নাকি ইলিয়াড অডিসি থেকে একখানি বড় জোর দু'খানি ট্র্যাজেডির বিষয় পাওয়া যায় আর "সাইপ্রিয়া" থেকে পাওয়া যায় বহুসংখ্যক এবং 'লিটল ইলিয়াড' থেকে পাওয়া যায় আটখানি নাটকের উপাদান। এরিস্টটল ব'লতে চান—"ট্রয়-যুদ্ধ ব্যাপারটির আদি মধ্য-অন্ত আছে বটে, কিন্তু তাই বলে তাকে "single action" বলা যাবে না। কারণ, প্রথমতঃ ব্যাপারটি এত বড় ও বহুকালব্যাপী যে সমগ্র ঘটনাকে একক কোন দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে ধারণ করা (embraced in a single view) সম্ভব নয়, দ্বিতীয়তঃ—দৈর্ঘ্য বা বিশালতা কমিয়ে দিলেও এত বহুমুখী বিচিত্র ঘটনা তাতে আছে—যে, তা'তে ঘটনার জটিলতা রসের ধারাকে ব্যাহত করতে বাধ্য। এই আলোচনার মাঝ দিয়ে, "কার্য-ঐক্য" বলতে এরিস্টটল কি বুঝতে চেয়েছেন তা যেমন সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে তেমনি এ সত্যও প্রকাশিত হয়েছে যে তাঁর "কার্য-ঐক্য" সকলে মেনে নেননি বা সেই নিয়ম মেনে সকলে কাব্য রচনা বা নাট্য রচনা করেন নি।

ছন্দের প্রশ্নে আসা যাক। এরিস্টটল সুন্দর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"Nature herself, as we have said, teaches the choice of the proper measure", ছন্দ শিক্ষা দেন প্রকৃতি নিজেই। অর্থাৎ ভাব বা বিষয় নিজের গতি-ভঙ্গিমা নিজেই আবিষ্কার করে নেয়। মহাকাব্যের গাম্ভীর্য গম্ভার চালের ছন্দেই সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত হতে পারে, তাই দেখা যায়—ত্রিমাত্রিক ট্রোকায়িক নৃত্যোপযোগী ছন্দ বা আয়াম্বিক ক্রিয়া-দ্যোতক

(expressive of action) ছন্দ বাদ দিয়ে মহাকাব্য' "হিরোয়িক মেজার" নির্বাচন করে নিয়েছে—কারণ the heroic is the stateliest and the most massive। গুরুগম্ভীর ভাবের জন্য ধ্রুপদী চালের ছন্দোলয়ই উপযুক্ত।

মহাকাব্য সম্পর্কে এরিষ্টটলের বক্তব্য সংক্ষেপে দাঁড়াচ্ছে এই যে ট্র্যাজেডির বিষয়বস্তুর মতোই, মহাকাব্যের বিষয় মানুষের আবেগকে (জৈবিক-মানবিক) গভীরভাবে আলোড়িত করবে—মহাকাব্যে **গুরু ও তীব্র আবেগময় বিষয়কে** রূপ দিতে হবে এবং রূপ দিতে হবে **বৃহদায়তনে ও গুরুগম্ভীর ছন্দে**।

রেনেসাঁ-যুগে মহাকাব্য-লক্ষণ

মহাকাব্যের আয়তনগত মহত্ত্ব স্বীকার করেও এরিস্টটল ট্র্যাজেডিকে 'higher form of art' বলেছেন এবং তা নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করারও চেষ্টা করেছেন। তাঁর কথার পক্ষে কে কতখানি সায় দিয়েছেন তার কোন প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু বিপক্ষের প্রমাণ বেশই পাওয়া যায়। একদিকে ভার্জিলের প্রতি মধ্যযুগের অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি, অন্যদিকে নাট্য সাহিত্যের চরম অবনতি—'histrions এবং vaganties' প্রভৃতিদের আশ্রয়ে কোনরকমে বেঁচে থাকা—এই অবস্থায় মহাকাব্যের মহত্ত্বের প্রতিস্পর্ধী হবে কে? সুতরাং সারা মধ্যযুগে এবং রেনেসাঁতেও মহাকাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি বলে সমাদৃত হয়েছে।

ভিদার (Vida) 'আর্স-পোয়েটিকা' (১৫২০)—হোরেসের আর্স পোয়েটিকার আদর্শে রচিত। হোরেস তাঁর নিবন্ধে নাট্যসাহিত্যকে মুখ্য আলোচ্য করেছেন, ভিদা মুখ্য আলোচ্য করেছেন মহাকাব্যকে। তবে মহাকাব্যের তত্ত্ব সম্পর্কে কোন গভীর আলোচনা তিনি করেন নি। তাঁর আলোচনার লক্ষ্য ভার্জিলের এনিডকে ভিত্তি ক'রে—মহাকাব্য রচনার ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারাদি প্রয়োগের নিয়ম কানুন তৈরী করা। হোরেসও তাঁর গ্রন্থিকায়—এই জাতীয় আলোচনা (ব্যবস্থাপত্র গোছের আলোচনা—prescriptive criticism) করেছেন। মহাকাব্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এইটুকুমাত্র—"The measure

suited to the exploits of princes and captains, and to the sorrow of war, Homer has shown us" (The Art of Poetry). অর্থাৎ রাজা ও সেনাপতিদের বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের এবং করুণ বিলাপের যে ছন্দ তা হোমার আমাদের দেখিয়েছেন। এই উক্তি থেকে মহাকাব্যের বিষয় ও রস সম্পর্কে যদি কিছু উদ্ধার করা যায় তা এই যে মহাকাব্যের বিষয় হচ্ছে—রাজা ও রাজপুরুষদের বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ এবং রস হচ্ছে—বীর-করুণ। অনুমানকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ নাই। "হোরেস' মহাকাব্য আলোচনায় অনাবশ্যক। ভিদা সম্পর্কেও একই কথা ;

ডেনিয়েল্লো মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করেন তাতে রেনেসাঁ কৃত লক্ষণের সাধারণ রূপটি পাওয়া যায়। তাঁর মতে—মহাকাব্য রাজা মহারাজার এবং উদার ও বীর যোদ্ধার বিখ্যাত বৃত্তের অনুকরণ। বলা বাহুল্য হোরেসের ধারণার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য আছে।

"**ত্রিসিন্নোর**" "পোয়েটিকা'-তে প্রথম এরিস্টটলকৃত লক্ষণটি আলোচিত ও প্রচারিত হয়। এরিস্টটলের অনুসরণে তিনি বলেন—মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সুবিখ্যাত ব্যক্তির জীবন এবং ঘটনা। মহাকাব্যে কার্য-ঐক্য (single action) থাকা চাই। ট্র্যাজেডিতে যেমন, কাল ঐক্য আবশ্যক, মহাকাব্যে তার কোন প্রয়োজন নেই। মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ও মহত্ত্বের জন্য পরিকল্পনার বিরাটত্ব (vastness of design) এবং বর্ণনা বাহুল্য (largeness of detail) অবশ্যই থাকা চাই।

ছন্দ সম্পর্কে ত্রিসিন্নোর বিশেষ বক্তব্য—মহাকাব্যের (heroic poem) পক্ষে 'Versi sciolti' অর্থাৎ প্রবাহী ছন্দই উপযুক্ত—স্তবকে স্তবকে সাজান উক্তি কাহিনীর প্রবাহকে ব্যাহত করে।

মিণ্টুর্নো মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা' এরিস্টটল-কৃত ট্র্যাজেডি-সংজ্ঞারই হুবহু অনুবর্তন। এমন কি, ভাব-মোক্ষণ (purgation or katharsis) ব্যাপারেও ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য তাঁর মতে, এক। শ্রব্য কাহিনীকাব্য রচয়িতাদের মিণ্টুর্নো তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—অধম শ্রেণী (bucolici) মধ্যম শ্রেণী (epici) এবং উত্তম শ্রেণী (heroici) 'who imitate the life of a single hero in noble Verse' এবং মহাকাব্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্তি বলে ঘোষণা করেছেন।

মিণ্টুর্নোর মতের বিশেষত্ব দেখা যায় 'কার্য-ঐক্য'কে অপরিহার্য মনে করায় এবং ঘটনার কালমাত্রাকে এক বৎসরে বেঁধে দেওয়ায়।

কণ্টেলভেত্রো গঠন সম্পর্কিত কয়েকটি মূল প্রশ্ন তোলেন। 'কার্য-ঐক্য' সম্পর্কে এরিস্টটল যে অনুশাসন দিয়েছেন তা মানতে তিনি রাজী নন। কারণ কাব্য আসলে কল্পনা-কৃত (imaginative history) সুতরাং ইতিবৃত্তের পক্ষে 'যা সম্ভব, কাব্যের পক্ষেও তা' সম্ভব। ইতিহাস যেমন কার্য-ঐক্যের খাতির না করে বিশেষ ব্যক্তির সমগ্র জীবনের বৃত্ত বর্ণনা করে, কাব্যও তেমনি তা করতে পারে। অর্থাৎ মহাকাব্য—(ক) এক ব্যক্তির বহুকার্য বা ঘটনা (many actions of one man) (খ) জাতির কোন বিশেষ কার্য (one action of a whole race) এবং (গ) বহুলোকের বহুকার্য (many actions of many people) রূপ দিতে পারে। অবশ্য কবি যেখানে 'কার্য-ঐক্য' বজায় রাখতে পারেন সেখানে কবি-শক্তির পরিচয় বেশী পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে 'কার্য-ঐক্য' না থাকলে মহাকাব্যই হবে না—এমন কোন কথা নেই।

'ঐক্য' নিয়ে এই সময়ে বেশ একটা বাদ প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম সাহিত্যিক-সমস্যা—'রোমান্স্' সাহিত্যের ঐক্যের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়।

এরিস্টটলের সূত্র প্রচারিত হওয়ার আগেই ইতালীতে এরিয়োস্টো (Ariosto) লেখেন—"ওরল্যাণ্ডো ফিউরিয়োসো' (Orlando Furioso) এবং বৈয়ার্দো (Boiardo) লেখেন—'ওরল্যাণ্ডো ইন্নামোরাতে (Orlando Innamorato)। এই দু'খানি কাব্যে এরিস্টটলের সূত্র মানা হয়নি। না-মানার বিরুদ্ধে এবং ঐক্যের অভাব মেটাতে ত্রিসিন্নো লেখেন—"ইতালিয়া লিবারেটা" (Italia Liberata) এবং 'কার্য-ঐক্য' বিধি লঙ্ঘন করে যে সব কাব্য লেখা হয়েছে, ভূমিকায় তাদের 'মহাকাব্যের জারজ' বলে গালি দেন।

এই গালিগালাজের প্রথম প্রতিবাদ করেন গিরালডি সিন্তিয়ো এবং "রোমাঞ্জি" সম্বন্ধে একখানি বইও লেখেন (১৫৪৯)। রোমাঞ্জির সমর্থনকল্পে তিনি দুটো যুক্তি দেখান:—প্রথম যুক্তি—রোমাঞ্চ জাতীয় সাহিত্য এরিস্টটলের সময় ছিল না। সুতরাং তার সূত্র রোমাঞ্চ সাহিত্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয় যুক্তি:—ভাবে-ভাষায়-রূপে-রসে টাসকান সাহিত্য গ্রীক সাহিত্য

থেকে পৃথক হবে এটাই স্বাভাবিক, এবং হওয়াও উচিত। দুই দেশের সংস্কৃতি ও রুচি ভিন্ন সুতরাং সাহিত্যও ভিন্ন হতে বাধ্য। 'রোমাঞ্জির লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে সিন্তিয়ো "হিরোয়িক কাব্য-'কে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন :— (ক) এক ব্যক্তির একটি কার্য যেখানে উপস্থাপিত, (খ) বহুব্যক্তির বহুকার্য যেখানে উপস্থাপিত (গ) এবং এক ব্যক্তির বহুকার্য যেখানে উপস্থাপিত। প্রথম শ্রেণীর নাম—'এপিক,' দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম "রোমান্টিক,' এবং তৃতীয় শ্রেণীর নাম--"বাওগ্রাফিকাল" বা চরিত-কাব্য। প্রথম শ্রেণী 'এরিস্টটল মতে এপিক' দ্বিতীয়, তৃতীয়ের নাম—"রোমাঞ্জি (Romanzi)। দুই শ্রেণীর রোমাঞ্জি কাব্যের মধ্যে চরিত কাব্যের বিষয় প্রধানত ঐতিহাসিক, এবং রোমান্টিক কাব্যের বিষয় কবি-কল্পিত। 'হিরোয়িক' কাব্য সম্পর্কে হোরেস যে বলেছেন—হিরোয়িক কাব্যে নায়কের শৈশব বর্ণনা নিয়ে কাব্য আরম্ভ করা উচিত নয়, একথা সিন্তিয়ো মানতে রাজী নন। এপিক বা রোমান্টিক জাতীয় হিরোয়িক কাব্যে ঐ রীতি না চলতে পারে—কিন্তু চরিত জাতীয় কাব্যে না চলার কোন হেতু নেই ; বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনের ঘটনা জানবার কৌতূহল সকলেরই আছে ; আর তা জেনে আনন্দও যে হয়, প্লুতার্ক প্রভৃতির রচনাই প্রমাণ, সুতরাং সুন্দর ছন্দে বর্ণনা করলে তা আরো আনন্দ দেবেই। অতএব নিয়ম করা যেতে পারে—যিনি এপিক লিখবেন তিনি কাহিনী কল্পনায় প্রথমেই মূল বিষয়ে প্রবেশ করবেন (in medias res), যিনি অনেক ব্যক্তির অনেক ঘটনা ব্যক্ত করবেন, তিনি প্রধান প্রধান ঘটনা বেছে নেবেন ; আর যিনি চরিতকাব্য লিখবেন তিনি আবশ্যক হলে, গোড়া থেকেই শুরু করতে পারেন। সিন্তিয়োর মতে এপিক অপেক্ষা এক হিসেবে রোমাঞ্জির স্থান উচ্চে। নীতি-শিক্ষার উদ্দেশ্য রোমাঞ্জি যতটা সিদ্ধ করে, এপিক ততটা করে না।

স্পেরোনি ও মিণ্টুর্নো, কাব্যের মধ্যে ঐক্য অপরিহার্য—এই মতটাই বিশেষ জোরের সঙ্গে জাহির করেন। স্পেরোনি বলেন—রোমাঞ্জি হয় এপিক না হয়—ছন্দে লেখা ইতিহাস, কাব্য নয়। কাব্যের সঙ্গে ইতিহাসের পার্থক্য —কার্য-ঐক্যের ব্যাপার নিয়েই। যে রচনায় ঐক্য—ঘটনার অঙ্গাঙ্গিযোগ থাকে না, তাকে বিষমব্যাস বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মিণ্টুর্নো বলেন—'কাব্য যুগ সাপেক্ষ বা যুগানুবর্তী হয় বটে, কিন্তু মূল নীতিকে লঙ্ঘন করার সাধ্য তার নেই। 'ঐক্য' কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য। রোমাঞ্জিতে

যে সব নায়ক নায়িকা পাত্র মিত্রাদির বর্ণনা পাওয়া যায় তার আকর্ষণ আছে, জনসাধারণ তার সমাদরও করে ; কিন্তু তবু তাকে বড় শিল্পকর্ম বলা যেতে পারে না। কারণ শিল্প হয়ে ওঠার প্রথম লক্ষণ হল—'ঐক্য' (unity), ঐক্য না থাকায় রোমাঞ্জিকে ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস বা পুরাণ-কথা বলা যায়। এপিকের মতো বিরাট আয়তন থাকলেই এপিক হয় না। যে আয়তনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই তা অসুন্দর। হোক না কেন অতিকায় যে দানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত সে কদাকারই। কাব্য যে যুগের বা যে দেশেরই হোক—'ঐক্য' (unity) ঘটনার অঙ্গাঙ্গিযোগ বা সঙ্গতি (proportion) এবং আয়তন (magnitude)—এ তিন বস্তু থাকা চাইই চাই। এই মূলসূত্র উপেক্ষা করবার সাধ্য কোন কাব্যেরই নেই। এই বাদপ্রতিবাদের মধ্যে **টোরকোয়াটো ট্যাসোই** প্রথম এপিক ও রোমান্টিক কাব্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন—'এপিক' ও কাব্য, 'রোমাঞ্জি' ও কাব্য এবং যে ঐক্য কাব্যের অপরিহার্য লক্ষণ সেই ঐক্য থাকার জন্যই কাব্য। তবে 'ঐক্য'-এর রূপ একরকম নয়। যেমন প্রাকৃতিক জগতে, তেমনি কাব্যের জগতেও দুই প্রকার ঐক্য রয়েছে। এক—**রাসায়নিক উপাদানের সরল ঐক্য**, দুই—**জীবদেহের যৌগিক ঐক্য**। হিরোয়িক কাব্যের ঐক্য 'সরল ঐক্য' নয়—'যৌগিক ঐক্য'। অবশ্য এই জাতীয় সিদ্ধান্তের পূর্বাভাস পাওয়া যায়—ক্যাপ্রিয়ানো'র (১৫৫৫) কথায়। কাব্যে ঐক্য থাকবে বটে কিন্তু সে ঐক্য বলতে একই ভাবের একটানা আবৃত্তি বোঝায় না (যেমন লোকগাথার বিলাপে বা "একলোগ" জাতীয় পল্লী-গাথায় দেখা যায়), ঐরূপ রচনা বিচ্ছিন্ন কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের চিত্রের মতোই সমগ্র একটি দেহ নয়। কাব্যে অঙ্গাঙ্গিযোগে যুক্ত একাধিক ঘটনার সমাবেশে জীবন-বৃত্ত তৈরী হয় এবং ঘটনা আরম্ভ থেকে ক্রমশঃ বিশেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়।

মহাকাব্যের ও রোমান্স সাহিত্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার পরে ট্যাসো মহাকাব্যের বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন।

(ক) মহাকাব্যের বিষয় ঐতিহাসিক ঘটনা হওয়া চাই।

(খ) যে কোন ইতিহাস হ'লেই চলবে না—প্রকৃত ধর্মের অনুশাসনের অধীনে সে ইতিহাস গড়ে ওঠা চাই। খ্রীষ্টধর্ম অনুশাসিত জীবনের ইতিহাস

চাই, পেগানদের ধর্ম নিয়ে লিখলে চলবে না। (ট্যাসোর পেগান-বিদ্বেষ লক্ষণীয়)

(গ) খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থের কাহিনী নিয়ে লিখলেও চলবে না। কারণ, সে সব কাহিনীর সঙ্গে কল্পনা মেশান চলবে না।

(ঘ) বিষয় অতি পুরাতন বা অতি আধুনিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতি-পুরাতন তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না। আর অতি আধুনিক ঘটনার সঙ্গে কাল্পনিক ঘটনা যোগ করা যায় না।

(ঙ) ঘটনা হওয়া চাই—মহত্ত্বপূর্ণ এবং গুরুগম্ভীর, বিরাট। ট্যাসোর মতে মহাকাব্যের সংজ্ঞা দাঁড়াচ্ছে—মহাকাব্য খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতির ঘটনা নিয়ে গড়া কাহিনী। এই ঘটনা আসলে খুব গুরুগম্ভীর ও বিখ্যাত বটে তবে এমন 'ধর্ম' পূত নয় যে তাতে পরিবর্তন ঘটানো চলবে না, অথবা সে ঘটনা খুব অতি প্রাচীন বা অতি আধুনিকও নয়। এইরূপ বিষয় অবলম্বন করায়—মহাকাব্য ইতিহাসের মতো যথাযথ বা বাস্তব হয়, ধর্মের মতো সত্যদর্শী হয়—কল্পিত কাহিনীর মতো স্বৈরাচারী হয়।

মহাকাব্যের রস সম্পর্কে, ট্যাসো এরিস্টটলের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। মহাকাব্যের ও ট্র্যাজেডির ঘটনা যদি একই রকম গুরুগম্ভীর ও বিখ্যাত হয় তা'হলে দু'য়ের রসও এক হতে বাধ্য। কিন্তু তা কি হয়? ট্র্যাজেডি-জাগায় ভয় ও শোচনা। মহাকাব্যকেও যে এই দুই ভাব উদ্রিক্ত করতে হবে এমন কোন কথা নেই। ট্র্যাজেডির বৃত্তে—ভাগ্য-বিপর্যয়ের দৃশ্য উপস্থাপিত হয় এবং তা করা হয় ভয়ানক ও করুণ গুরুগম্ভীর ঘটনার সমবায়ে। কিন্তু মহাকাব্যের বৃত্তে থাকে উদাত্ত বীরত্বের ঘটনা; নায়কের থাকে ঔদার্য, বীর্য, ক্ষমা, দয়া, ধর্মবোধ, তিতিক্ষা প্রভৃতি মহদ্ গুণ সমূহ।

উভয়ের নায়ক বংশ মর্যাদা ও সামাজিক প্রতিপত্তির দিক দিয়ে একরূপ হলেও, প্রকৃতিতে পৃথক। ট্র্যাজেডির নায়ক হবে—না-অতিভাল না-অতিমন্দ, অন্যপক্ষে মহাকাব্যের নায়ক হবে সর্বতোভাবে মহান—ধর্মনিষ্ঠ। যেমন "ঈনিস" ধর্মনিষ্ঠ, "আমাদিস" আজ্ঞানুবর্তী, "একিলিস" বীর্যবান যোদ্ধা, "ইউলিসিস্" প্রজ্ঞাবান, সুতরাং ট্র্যাজেডি ও মহাকাব্য শুধু যে আয়তনের দিক দিয়েই পৃথক তা' নয়, রসের ও নায়ক প্রভৃতির দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। ট্যাসো সূত্রভাষ্য তৈরী করেই ক্ষান্ত হননি 'জেরুজালেমে লিবারেটা'

("Gerusalemme Liberata") মহাকাব্য রচনা করে দেখিয়েছেন—মহাকাব্য কেমন হওয়া চাই। এ মহাকাব্যকে কেন্দ্র করে জোর বাদপ্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কেউ কেউ ট্যাসোকে, হোমার ভার্জিল এবং এরিয়োস্টার চেয়েও বড় কবি বলে ঘোষণা করেন।

রেনেসাঁ-যুগে ফ্রান্সে সকলে মহাকবিকে এবং মহাকাব্যকে সম্ভ্রমের চোখে দেখলেও, মহাকাব্য রচনায় বা মহাকাব্যের স্বরূপ নিরূপণে কেউই তেমন কিছু করতে পারেন নি। Du Bellay কবিদের ইলিয়াডের বা এনিডের মতো মহাকাব্য লিখে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য আহ্বান করেছেন। পেলেতিয়েকে—(Pelletier, ১৫৫৫) বলতে দেখা যায়, মহাকবি না হতে পারলে কবিজন্মই বৃথা—মহাকাব্য হচ্ছে অন্যান্য কাব্যের তুলনায় মহাসাগর, অন্যান্য কাব্য নদী বিশেষ। ফরাসী কবিদের হারকিউলিসের বীরত্ব অবলম্বনে একখানা 'হিরাক্লিদ' লেখা উচিত। কবি হতে হলে ভার্জিলের মত কবি হওয়া দরকার।

এত আহ্বান অনুপ্রেরণা সত্ত্বেও, রঁসার্দ (Ronsard) ২০ বছর ধরে চেষ্টা করেও "Franciade" শেষ করতে পারেননি, তবে বই শেষ না হলেও দু'দুটো ভূমিকা লেখেন (১৫৭২, ১৫৮৪) এবং মহাকবি ও মহাকাব্যের স্বরূপ বোঝাতে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে—মহাকাব্য যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা নিয়ে লেখা কাব্য, এই ঘটনার ব্যাপ্তি এক বছরের বেশী হলে চলবে না। উপস্থাপনা বাস্তবানুগ হওয়া চাই। বর্ণনায় কালাতিক্রমণ দোষ ও তথ্যের বিকৃতি থাকা দোষাবহ, তবে খুব পুরাতন কাহিনী সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য নয়, আর তা নয় বলেই—বহুপ্রাচীন বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বন করেই মহাকাব্য লেখা উচিত।

ভকুলিনের (Vaquelin) মতে—মহাকাব্য বিরাট ও বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ, একটা স্বতন্ত্র জগৎ যেখানে মানুষ, বস্তু ও ভাব-ভাবনা বিস্ময়জনক রূপে পরিকল্পিত হয়েছে। এই পর্যন্তই এঁদের আলোচনা।

ইংলণ্ডেও মহাকাব্য নিয়ে এই সময়ে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়নি। Webbe Puttenham, Harrington প্রভৃতি এ সম্পর্কে যে মন্তব্যাদি করেছেন তা খুবই মামুলি কথা। ওয়েব বলেছেন—"That princely part of Poetry wherein are displayed the noble acts and valiant exploits of puissant captains, expert soldiers,

wise men, with the famous reports of ancient times." অর্থাৎ, মহাকাব্য হচ্ছে কাব্যের রাজা এবং তাতে সেনাপতি বীরযোদ্ধা ও জ্ঞানীদের মহৎকার্য ও বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হয় অতীতের কীর্তি-কলাপের কথা। পুত্তেনহাম বলেছেন—"long histories of the noble guests of kings and great princes, intermeddling the dealings of Gods, demi-gods and heroes and weighty censequences of peace and war." অর্থাৎ, মহাকাব্য রাজরাজড়ার, রাজ-অমাত্যদের দীর্ঘ কাহিনী, তাতে দেবতা, উপদেবতা এবং বীরদের কার্যকলাপ মেশানো থাকে এবং সংগ্রাম ও শান্তির মত বড় বড় ব্যাপারের বর্ণনা থাকে। পুত্তেনহামের মতে—মহাকাব্য ঐতিহাসিক কাব্য, কারণ তা'তে পূর্বপুরুষদের শৌর্য-বীর্যের ও ধর্ম-বীর্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। সিডনি (Sidney—Defence of Poetry-র লেখক) মহাকাব্যকে সর্বোত্তম কবিকীর্তি বলে সম্মান দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু মহাকাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেননি। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত হিসাব নিকাশ এখানেই শেষ।

"এপিক" সম্পর্কে পরবর্তী যুগেও খুব ব্যাপক আলোচনা না হলেও একেবারে হয়নি তা নয়। মহাকবি বা মহাকাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, প্রসঙ্গত কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ড্রাইডেন "হিরোয়িক" কাব্য বিশেষতঃ হিরোয়িক ড্রামার পক্ষ সমর্থন প্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ মন্তব্য করেছেন এবং সে মন্তব্য প্রাচীন ধারণারই নতুন আবৃত্তিমাত্র। "Annus Mirabilis" কাব্যের ভূমিকা থেকে তাঁর "এপিকের" ধারণা সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই কাব্যে যুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—ভয়ঙ্কর, ও বিস্ময়কর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও তিনি কাব্যখানিকে "এপিক" না বলে "হিস্টরিকাল" বলছেন—ঘটনা ও পাত্র পাত্রীদের "হিরোয়িক" হওয়ার যোগ্যতা থাকলেও কার্য-ঐক্যের অভাব (action is not properly one) থাকায় "এপিক" বলেননি। দেখা যাচ্ছে ড্রাইডেনের মতেও, এপিকের "কার্য-ঐক্য" থাকা আবশ্যক। বৃহৎ আকারে বিখ্যাত বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করলেই মহাকাব্য হবে না ছন্দোবদ্ধ ইতিহাসও তা'হলে মহাকাব্যের মর্যাদা পেয়ে যাবে। "কার্য-ঐক্যই" মহাকাব্যকে ছন্দোবদ্ধ ইতিহাস (history in verse) থেকে পৃথক করেছে এবং উন্নততর প্রতিষ্ঠা দান করেছে। তবে "হিরোয়িক পোয়েট্রি" বলতে

ড্রাইডেন বুঝেছেন সেই জাতীয় রচনা যার বিষয় প্রেম ও বীরত্ব (love and valour ought to be the subject of it.)

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাকাব্য সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছে তাতে হবস্ (Hobbes), গিববন (Gibbon), হিউম (Hume) প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মনস্বীদেরও যোগদান করতে দেখা যায়। এই সময়ে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে "হিরোয়িক পোয়েট্রি" রচনার একটা আবেগ আসে। ইংলণ্ডে 'Davenant (Gondibert), Chamberlayne (Pharoninda), Dryden (Annus Mirabilis). Blackmore (Prince Arthur) প্রভৃতি এবং ফ্রান্সে Chapelain Scudery Father le Moyne প্রভৃতি মহাকাব্য রচনা করতে প্রযত্ন করেন। হবস্ ডেভনাস্টের—"গোণ্ডিবার্ট"—কাব্যের ভূমিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে (১৬৫০) এবং টমাস হবস্ কৃত ইলিয়ড অডিসি কাব্যের অনুবাদের ভূমিকায় (১৬৭৬) হিরোয়িক কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। হিউমের—"Letter to the authors of the Critical Review, Concerning the Epigoniad of Wilkie, April 1759. এবং গিববনের—"An inquiry whether a catalogue of the Armies sent into the field is an essential part of an epic poem," (Dec. 23, 1763) মহাকাব্যের স্বরূপ বিচারে যথেষ্ট আলোকপাত করে। মহাকাব্যের মহত্ত্ব যে শুধু বাহ্য ঘটনার আড়ম্বরের মধ্যেই নিহিত নয়—অন্তরে বাহিরে মহাকাব্যকে বড় হতে হবে—এই ধারণাই দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করা হয়। ড্রাইডেনের উক্তি—"A Heroic poem, truly such, is undoubtedly the greatest work which the soul of man is capable to perform (Dedicatian of the Aeneis) পুরাতন কথাকেই জোর দিয়ে বলা মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এডিসনের "প্যারাডাইস লষ্ট"—মহাকাব্য আলোচনা (১৭১২) পোপের লেখা "ইলিয়াডের ভূমিকা" (১৭১৫) এবং অডিসির পরিশিষ্ট (১৭২৬) উল্লেখ দাবী করিতে পারে বই কি? তবে নতুন কথা বলতে যা বুঝায় তা বেশী পাওয়া যায় না। তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও, সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রচুর ফসল ফললেও মহাকাব্যের স্বরূপ নির্ধারণ সম্পর্কে খুব নতুন কিছু আলোচনা পাওয়া যায় না। বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে দেখা যায়—

মহাকাব্য সম্বন্ধে অনেকেই অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে W. P. Ker (এপিক এ্যাণ্ড রোমান্স—১৯০৮) ডিকসন (ইংলিশ এপিক এ্যাণ্ড হিরোয়িক পোয়েট্রি—১৯২২) এবারক্রোম্বি (দি এপিক—১৯২৪) Tillyard—(দি ইংলিশ এপিক ট্র্যাডিসান—১৯২৬) (Chadwick—দি গ্রোথ অফ্ লিটারেচার—৩ খণ্ড) উল্লেখযোগ্য।

এঁদের মধ্যে মহাকাব্যের 'তত্ত্ব' নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন ডবলু. পি. কের এবং ল্যাসলি এবারক্রোম্বি মহাশয়। কের মহাশয় এপিক ও রোমান্সের পার্থক্য নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তাতে রেনেসাঁ যুগের প্রভাবই সমধিক। এবং তা অনেকটা এরিস্টটলকৃত সিদ্ধান্তেরই ভাষ্য। "হিরোয়িক এজ" সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা অবশ্য এরিস্টটলে নেই, হিরোয়িক যুগে হিরোয়িক কাব্যের জন্ম—এ সিদ্ধান্তের বীজও পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে নেই; কিন্তু তিনি তার আলোচনায় মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা পোয়েটিক্সেরই কথা। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এরিস্টটলের মত তিনিও লিখেছেন—"The action of an heroic poem must be of a certain magnitude"। তারপর এরিস্টটল যেমন লিখেছেন—"The plot manifestly ought, as in Tragedy, to be constructed on dramatic principles."—"The poet should speak as little as possible in his own person for it is not this that makes him an imitator', ডবলু. পি. কের মহাশয়ও লিখেছেন—"Without dramatic representation of the characters, epic is mere history or romance, the variety and life of epic are to be found in the drama that springs up at every encounter of the personages—" অর্থাৎ, ইতিহাস ও রোমান্সের সঙ্গে মহাকাব্যের পার্থক্য—পাত্র-পাত্রীর নাটকীয় উপস্থাপনায়—নাট্যসুলভ উক্তি-প্রত্যুক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে। তাঁর মতে মহাকাব্যের প্রাণ পাত্র-পাত্রীর নাটকীয়তার মধ্যে নিহিত—"its life is in the drama of the characters"।

রেনেসাঁ-যুগে ইতিহাস, রোমান্স, চরিত এবং মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তার তুলনায় কের মহাশয়ের এই মন্তব্য বেশী আলোকসম্পাতী এ কথা বলা যায় না। কারণ ইতিহাসের বা

রোমান্সের সঙ্গে মহাকাব্যের পার্থক্য শুধু পাত্র-পাত্রীর নাটকীয়তায় নয়—আসল পার্থক্য "কার্য-ঐক্য" এর মধ্যে, রূপের বিরাটত্ব এবং রসের গভীরতার মধ্যে। শ্রদ্ধেয় কের মহাশয় মহাকাব্যের বৈশেষিক লক্ষণটি ঠিক নিরূপণ করতে পারেন নি।

ল্যাস্‌লি এবারক্রোম্বি মহাশয় মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে প্রথমেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, বলেছেন—Rigid definitions in literature are however dangerous.—কারণ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি দোষ এড়িয়ে লক্ষণ নিরূপণ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে লিখেছেন—"An easy way to define epic, though not a very profitable way, would be, to say simply, that an epic is a poem which produces feelings similar to those produced by Paradise Lost or the Iliad, Beowulf or the Song Roland", অর্থাৎ মহাকাব্য হচ্ছে সেই কাব্য যা প্যারাডাইজ লস্ট, ইলিয়াড, বিউলফ বা সঙ্‌ অফ্‌ রোলাণ্ডের মত ভাব বা রস জাগায়। সমস্ত মহাকাব্যের সামান্য ধর্ম কি তা এক কথায় বলতে তিনি চেষ্টা করেন নি কিন্তু মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য একে একে ব্যক্ত করেছেন।

(ক) প্রত্যেক মহাকাব্যেই একটা কাহিনী থাকবে এবং সে কাহিনী মহান আকারে এবং সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে হবে (the story must be told well and greatly)।

(খ) বিষয়ে বা বর্ণনায় গভীর তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলা দরকার। কিন্তু তাই বলে রূপক (allegorical) করে তুললে চলবে না। রূপকের বিষয় কাল্পনিক আর মহাকাব্যের বিষয় হওয়া চাই অতিবাস্তব (solid reality of material)। স্বকপোলকল্পিত বিষয় নিয়ে মহাকাব্য লেখা চলবে না, প্রথিত বিষয়কে কল্পনায় বিস্তারিত করে উপস্থাপনা করতে হবে। মহাকাব্যে বিষয় আবিষ্কৃত নয় - নির্বাচিত। জীবনের সংকেত দিয়েই রূপকের সার্থকতা, জীবনের প্রদর্শনে মহাকাব্যের সিদ্ধি। তত্ত্বমূল্যে রূপকের, এবং রসমূল্যেই মহাকাব্যের প্রতিষ্ঠা। তবে 'বিষয়ের বাস্তবতা' কথাটা সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করতে হবে। তাৎপর্য এই যে কাহিনীটি জনসাধারণের কাম্যবস্তু হওয়া চাই। এক কথায় বিষয়বস্তু সার্বজনীন হওয়া দরকার। ঘটনা হিসাবে

যা ঘটছে তাই তো একমাত্র বাস্তব নয়, মানুষ যা পরম পুরুষার্থ বলে মনে করে—সেইসব তত্ত্ব যা "human truth"—জীবন সত্য ব্যক্ত করে, তাও বাস্তব। সিজার যেমন বাস্তব 'শয়তান' তেমনি বাস্তব। মনে হতে পারে, তাহ'লে ঐতিহাসিক ঘটনাই মহাকাব্যের উপাদেয় বিষয়বস্তু—কথাটা আংশিক সত্য। কাব্যিক সত্য যাতে আছে সে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক যাই হোক না কেন সেইটেই আসল বিষয়বস্তু। মহাকাব্য নিছক ঘটনার বর্ণনামাত্র নয়, ঘটনার সমবায়ে জীবনের রূপের ভিতর দিয়ে জীবনরহস্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি। জীবনরহস্যের ব্যঞ্জনা (symbolic purpose) যা'তে নেই তা' মহতী সৃষ্টির মর্যাদা পেতে পারে না।

(গ) শুধু গভীর তীব্র রূপে কাহিনী রচনা করলেই চলবে না—বৃহৎ আয়তনেও (largely and intensely) রচনা করতে হবে এবং রচনা করতে হবে—গুরুগম্ভীর ও প্রবাহী ছন্দে। মোটকথা—'epic poetry must be an affair of evident largeness'—শুধু তাই নয়—'the subject must be of capital importance in its treatment'. কিন্তু এই ধরনের কাহিনী গড়ে উঠবে যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, তাকে অসাধারণ হ'তে হবে—অতিমানুষ হ'তে হবে। যে কাব্যে—"summation for its time of the values of life" প্রকাশিত হয় তার নায়ক হবে অবশ্যই এমন একজন বা একাধিক জন যাতে—"the whole virtue and perhaps also the whole failure of living seems superhumanly concentrated." উপযুক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় না করে মহাকাব্যোচিত ঘটনা ঘটতেই পারে না।

(ঘ) এ ছাড়া আরো নিখুঁত লক্ষণ নির্ধারণ করতে গেলে—এত অতিব্যাপ্তি ঘটবে যে যে-কোন দীর্ঘ শ্রব্য বা কাহিনী কাব্য মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে অথবা এমন সব বাহ্য লক্ষণ জুড়ে দেওয়া হবে যা অনেক খাঁটি মহাকাব্যে পাওয়া যাবে না। যেমন মহাকাব্যে যোদ্ধার তালিকা আবশ্যক কি না, নরক ও দেবদেবার বর্ণনাদি থাকবে কি না—এ সব প্রশ্নের আলোচনা হ'য়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এ সব বাহ্য লক্ষণ অপরিহার্য লক্ষণ নয়। অনেক মহাকাব্যে আছে বলেই যে সব মহাকাব্যেই রাখতে হবে এমন কোন কথা নেই। চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য যোদ্ধার তালিকা দেওয়ার উপযোগিতা থাকতে পারে, মানব অস্তিত্বের রহস্য ব্যক্ত করতে অতিপ্রাকৃতের অবতারণার প্রয়োজন

থাকতে পারে ; কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না—"It is of man, and man's purpose in the world that the epic poet has to sing ; not of the purpose of gods"। এবারক্রোম্বির মহাকাব্য লক্ষণ আলোচনা এখানেই শেষ।

এবার ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যাক এবং দেখা যাক প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কে কতটুকু সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে "মহাকাব্য লক্ষণ"

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশের চেষ্টা বলা যেতে পারে, গোড়া থেকেই করা হ'য়েছে। ভামহ ও দণ্ডীর মধ্যে যিনিই প্রাচীন হোন, উভয়েই মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছেন। দণ্ডী কাব্যাদর্শ গ্রন্থে নিম্নলিখিত লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন :—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্।
আশীর্ণমক্রিয়াবস্তুনির্দেশো বাঽপি তন্মুখম্॥
ইতিহাসকথোদ্ভূতমিতরদ্বা সদাশ্রয়ম।
চতুর্বর্গফলায়ত্তং চতুরোদাত্তনায়কম্॥
নগরার্ণব শৈলর্তু চন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ।
উদ্যানসলিলক্রীড়া মধুপানরতোসবৈঃ॥
বিপ্রলম্ভৈর্বিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণনৈঃ।
মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনোয়কাভ্যুদয়ৈরপি॥
অলঙ্কৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরম্
সর্গৈরণাতিবিস্তীর্ণৈঃ শ্রব্যবৃত্তৈঃ সুসন্ধিভিঃ।
সর্বত্র ভিন্নবৃত্তান্তৈরুপেতঃ লোকরঞ্জনম্
কাব্যং কল্পান্তরস্থায়ি জায়েত সদলংকৃতি।

অর্থাৎ—

(ক) মহাকাব্য হবে 'সর্গবন্ধ'।

(খ) কাব্যের প্রারম্ভে থাকবে—আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তুনির্দেশ।

(গ) বিষয়বস্তু হবে ইতিহাসকথা থেকে গৃহীত বা লোকসিদ্ধ অথবা স্ববুদ্ধিকল্পিত,– যে কোন বর্ণের শ্লাঘ্যব্যক্তির কাহিনী। (টীকাকার মতে)

(ঘ) চতুর্বর্গ সাধক।

(ঙ) নায়ক হবে চতুর (বিদগ্ধ বা কুশল), উদাত্ত (শৌর্যত্যাগাদিগুণযুক্ত + উদার + বংশবীর্যাদিভিঃ প্রথিতঃ)

(চ) নগর-অর্ণব—শৈল, ঋতু চন্দ্রোসূর্যোদয় উদ্যান-ক্রীড়া—সলিল-ক্রীড়া—মধুপান প্রভৃতি নানাবিষয়ের বর্ণনা।

(ছ) অলঙ্কার থাকবে প্রচুর।

(জ) অসংক্ষিপ্ত অর্থাৎ বৃহদাকার হওয়া চাই।

(ঝ) রস ও ভাব নিরন্তর থাকা চাই।

(ঞ) সর্গ হবে শ্রব্যবৃত্ত, সুসন্ধিযুক্ত ও অনতিবিস্তীর্ণ।

(ট) নানা বৃত্তান্তের অবতারণা করতে হবে।

জনৈক টীকাকার সংক্ষেপে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যটুকু ব্যক্ত করেছেন—লিখেছেন—**"নায়কগৌরবং গ্রন্থস্য মহত্ত্বং চ যস্মিন অস্তি……"** অর্থাৎ যে কাব্যে একাধারে নায়ক গৌরব এবং গ্রন্থের মহত্ত্ব বা বিশালতা আছে সেই কাব্যই মহাকাব্য॥ "নায়ক গৌরব" কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। চতুর ও উদাত্ত নায়ক আশ্রয় করে যে ঘটনা ঘটে, তার মহত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। উদাত্ত নায়কের বৃত্ত—ইতিহাসোদ্ভূত বা সজ্জনাশ্রয় হবে—এটাই স্বাভাবিক। তারপর বৃত্তটিকে চতুর্বর্গফলায়ত্ত করতে চেষ্টা করলে—নানা বিষয়ের বর্ণনাদ্বারা সমৃদ্ধ করলে এবং নানা বৃত্তান্তোপেত করলে বৃত্তের আয়তন অবশ্যই বৃহৎ হতে বাধ্য। মোটকথা—নায়কের মহত্ত্বে বিষয়ের মহত্ত্ব এবং বিষযের বিস্তারে আয়তনের বৃহত্ত্ব এবং দুইয়ের সংযোগে মহাকাব্যের মহত্ত্ব—এই ধারণা নিয়েই লক্ষণটি করা হয়েছে।

বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃত 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে (১৪শ শতক) দণ্ডীকৃত লক্ষণকেই ভিত্তি করে লক্ষণ নিরূপণ করা হয়েছে এবং দণ্ডীকৃত লক্ষণটিকেই পরিষ্কৃত করা হয়েছে। দণ্ডী যেখানে খুব সাধারণ ভাবেই সূত্র করেছেন, বিশ্বনাথ সেখানে সুনির্দিষ্ট গণ্ডী এঁকে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই হিসাবে বিশ্বনাথ মহাকাব্য আলোচনাকে বেশ খানিকটা এগিয়ে নিয়ে এসেছেন।

বিশ্বনাথ-কৃত লক্ষণ :—

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকোনায়কঃ সুরঃ
সদ্বংশ ক্ষত্রিয়ো বাঽপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥

একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহুবোঽপি বা
শৃঙ্গারবীর শান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে ॥
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্
চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং লভেৎ।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দেশ এব বা
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্তনম্ ॥
একবৃত্তময়ৈ পদ্যৈরবসানেঽন্যবৃত্তকৈঃ
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘা সর্গা অষ্টাধিকা ইহ
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ
সন্ধ্যা সূর্যেন্দু রজনী প্রদোষ ধ্বান্ত বাসরাঃ
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভৌ চ মুনি স্বর্গ পুরাধ্বরাঃ
রণপ্রয়ানোপযম মন্ত্র পুত্রোদয়াদয়ঃ
বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ।
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা
নামাস্য সর্গোপাদেয় কথয়া সর্গ নাম তু ॥

বলা বাহুল্য, লক্ষণটি "সাঙ্গোপাঙ্গো" যুক্ত এককথায় বর্ণনাত্মক (descriptive)। উল্লিখিত লক্ষণ বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে :—

(১) মহাকাব্য সর্গবন্ধ হবে—অর্থাৎ বৃত্তের বিভাগসমূহ চিহ্নিত করতে 'অধ্যায়' 'পরিচ্ছেদ' 'উচ্ছ্বাস' প্রভৃতি নামের পরিবর্তে, "সর্গ" শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

*(২) নায়ক হবে (ক) ধীরোদাত্তগুণান্বিত সুর অর্থাৎ দেবতা স্বভাব কোন ব্যক্তি (খ) ধীরোদাত্তগুণান্বিত সদ্বংশ ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়েতর (গ) কুলশীলসম্পন্ন এক বা বহু রাজা ॥

(৪) বৃত্ত হবে (ক) ইতিহাসোদ্ভব অর্থাৎ ঐতিহাসিক অথবা সজ্জনাশ্রয় অনৈতিহাসিক বা কবি কল্পিত।)

(৫) বৃত্তে নাটকসন্ধি (মুখ+প্রতিমুখ+গর্ভ+বিমর্ষ+উপসংহতি+) থাকবে।

* শৃঙ্গার বীর শান্ত ও করুণের একটি।

(৬) ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের কথা থাকবে এবং এদের একটিকে মুখ্যভাবে সফল করতে হবে।

(৭) প্রারম্ভে (ক) নমস্কার
(খ) আশীর্বাদ
বা
(গ) বস্তুনির্দেশ } থাকবে।

*(৮) একরূপ ছন্দে লেখা (অবসানে অন্য ছন্দ) নাতিস্বল্প নাতিদীর্ঘ আট বা তদধিক সর্গ থাকবে।

(৯) সর্গের শেষে ভাবী সর্গের সূচনা করতে হবে।

(১০) সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রজনী, প্রদোষ, দিবা, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, ঋতু, বন, সাগর, মিলন, বিরহ, মুনি, স্বর্গপুর, যজ্ঞ, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রোৎপত্তি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাঙ্গোপাঙ্গ বর্ণনা থাকবে।

*(১১) নামকরণ হবে :—
(ক) কবির নামানুসারে
বা (খ) বৃত্তের ,,
বা (গ) নায়কের ,,
বা (ঘ) অন্য কারো নামানুসারে

(১২) সর্গের নাম রাখতে হবে—যে বিষয়টি সর্গে মুখ্য ভাবে বা উপাদেয়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে তার অনুসারে।

এই লক্ষণে—নায়ক, রস, সর্গসংখ্যা সর্গের নামকরণ, কাব্যের নামকরণ সম্পর্কে নির্দিষ্ট সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। মহাকাব্যের নায়ক যে কেউ হতে পারবে না, তাকে 'ধীরোদাত্ত' হতে হবে—এই কথাটি প্রণিধানযোগ্য। ধীরোদাত্ত বলতে বুঝায়—

অবি-কথনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ
স্থেয়ান নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্ত দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ।

এরূপ ব্যক্তি যে-সে রসের আলম্বন বিভাব হতে পারে না। শৃঙ্গার বীর শান্ত ও করুণ রস ধীরোদাত্ত নায়ক আশ্রয় করে যেখানে নিষ্পন্ন হয় সেখানে

রসের গাম্ভীর্য অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং বিষয় মহত্ত্বপূর্ণ না হয়ে পারে না। অধিকন্তু এরূপ মহত্ত্বপূর্ণ বিষয় রস-সংবেদনা যখন অষ্টাধিক সর্গ জুড়ে থাকে তখন রসবোধের সঙ্গে আর একটা বোধ—আয়তন-মহত্ত্ব—এসে যুক্ত হয়। এই দুই মহত্ত্ববোধ এক হয়ে মহাকাব্যের রস সম্পূর্ণ হয়।

পূর্বোক্ত লক্ষণ গুলির অনেকগুলিই বাহ্য লক্ষণ বটে তবে যেমন প্রাচ্যে তেমনি প্রতীচ্যেও এরূপ কয়েকটি প্রথা মেনে চলা হয়েছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

(ক) প্রথম স্ত্র করা হয়েছে—মহাকাব্য 'সর্গবন্ধ' হবে। আমাদের দেশের আর্য মহাকাব্য দু'খানি—রামায়ণ ও মহাভারতে এ প্রথা খাটে নি বটে কিন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্যগুলি 'সর্গবন্ধ' প্রথা মেনে চলেছে। প্রতীচ্যেও প্রথা মানার রীতি লক্ষ্য করা যায়—আমাদের যেমন 'সর্গ' ওদের তেমনি আছে "Book"। হোমার থেকে আরম্ভ করে সকলেই "Book"-বন্ধ কাব্য রচনা করেছেন।

(খ) আর একটা স্ত্র করা হয়েছে—প্রারম্ভে আশীর্বাদ নমস্কার বা বস্তুনির্দেশ থাকবে। প্রথা বটে কিন্তু সার্বভৌম প্রথা। A. W. Verity—"Paradise Lost" এর টীকা রচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—"The invocation of the Muse in an epic convention।" বাগ্‌দেবতার কৃপা ছাড়া মহাকাব্য রচনা সম্ভব নয় বলেই মহাকবিরা ইষ্টদেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে রচনা আরম্ভ করেছেন এবং প্রার্থনার পরেই—"বস্তুনির্দেশ" (introducing the theme) করে জানিয়ে দিয়েছেন কি বিষয় নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। এ রীতি হোমার থেকে চলে এসেছে এবং বেশীকম সবদেশের মহাকাব্যই এই রীতি মেনে চলেছে।

(গ) অন্য বাহ্যলক্ষণও প্রথার মর্যাদা পেয়েছে—যেমন "নানাবিষয়ের বর্ণনা + নানা বৃত্তান্তের অবতারণা"। এরিস্টটল বলেছেন—এইসব নানা বিষয়ের বর্ণনা ও বৃত্তান্ত "add mass and dignity to the poem।"

কাব্যের 'ব্যাপকতা' বা বৈচিত্র্য (variety) সৃষ্টির জন্য এই বর্ণনাবাহুল্য যাকে বলা হবে "epic description"—থাকা চাই। "বর্ণনাবাহুল্য" থাকে বলেই মহাকাব্যের রচনার ভেতর দিয়ে "একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া মানবের চিরন্তন

সামগ্রী করিয়া তোলে" (রবীন্দ্রনাথ)। 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে'—এই প্রবৃত্তির ফলেই সম্ভব হয়েছে।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে—'epic simile'র কথা। তারপর নরকদর্শন (hell) এবং দেবদেবীর বা অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়াকলাপও (supernatural machinery) প্রতীচ্য দেশে প্রথা হিসাবে প্রথিত হয়েছে। 'Catalogue of heroes' মহাকাব্যের জন্য অত্যাবশ্যক কি না এমন প্রশ্নও উঠেছে এবং আলোচিত হয়েছে। যা হোক, মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করতে, বৈশেষিক লক্ষণ নির্দেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাহ্য লক্ষণের কথাও বলা হ'য়েছে এবং এদেশে ওদেশে সব দেশেই তা হয়েছে।

সত্যবটে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করতে বর্ণনারীতি অবলম্বন করা হয়েছে কিন্তু তাই বলে একথা সত্য নয় যে অন্যদেশ যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে তা' থেকে আমরা দূরে আছি। মহাকাব্যের বিষয়-গৌরব, নায়ক-গৌরব এবং আয়তন-গৌরব একটিমাত্র শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার চেষ্টা প্রতীচ্যে সফল হয়েছে, আমাদের দেশে হয়নি—এ কথা কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন বটে কিন্তু তা' সত্যি নয়। আয়তন-গৌরবকে (scale) পৃথক সূত্রেই সবাই নির্দেশ করেছেন এবং আমাদের দেশে এই সূত্রটিকেই আরো বিস্তারিত করে বলা হয়েছে—অষ্টাধিক সর্গ থাকবে ইত্যাদি সূত্রকে নিছক বাহ্য লক্ষণ বলা যায় না। মহাকাব্য মহাসত্ত্ব অতিকায় প্রাণী, সুতরাং অতিকায়ত্বকে অপরিহার্য লক্ষণ বলেই ধরতে হবে। তবে যা অতিকায় তাই মহাসত্ত্ব এ হলে কোন কথা ছিল না। মহাসত্ত্ব না হয়েও অতিকায় হওয়া সম্ভব এবং তা সম্ভব বলেই মহাকাব্যকে শুধু অতিকায়—এ হলেই চলবে না। ধীরোদাত্ত নায়কের কাহিনী—লোকপ্রসিদ্ধ কাহিনী হতে হবে, শৃঙ্গার বীর বা শান্ত বা করুণ প্রধানতঃ এই চার রসের একটির কাহিনী হতে হবে। সুতরাং নায়ক, বিষয় ও রস সম্পর্কে বিধিনিষেধ যা করা হয়েছে তা বর্ণনীয় বিষয়ের মহত্ত্বের গুরুত্ব লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। নায়ক, বিষয় ও রস আপাতত পৃথক পৃথক বিষয় বলে মনে হ'লেও, একের সঙ্গে অপরে অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত। নায়কের প্রকৃতি বিষয়ের এবং রসের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে ব'লেই লক্ষণ নিরূপণে নায়কের বৈশিষ্ট্য সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের বৈশিষ্ট্য এবং রসের বৈশিষ্ট্য উদাহৃত হয়েছে।

মহাকাব্যের নায়ককে যে বেশ একটু অসাধারণ হ'তে হবে—শৌর্যে বীর্যে ঔদার্যে এককথায় গুণগৌরবে অনন্যসাধারণ হতে হবে, এ কথা প্রতীচ্যের সাহিত্যশাস্ত্রেও জোর দিয়ে বলা হ'য়েছে। (এবারক্রোম্বির আলোচনা দ্রষ্টব্য)। তারপর বিষয়ের কথা। ইতিহাসোদ্ভব কাহিনীর বা সজ্জনাশ্রয় কাহিনীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই ধারণা নিয়েই যে মহাকাব্যের বিষয়কে 'মহৎ' হতে হবে অর্থাৎ এমন হতে হবে যা মানব মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করবে, যার আবেদন সার্বজনীন যা মহত্ত্ববোধের উদ্বোধক। এবারক্রোম্বি মহাশয়ের ভাষায় বলা যাক, "At any rate the subject must be of capital importance in its treatment. It must be symbolic—not as a particular and separable assertion, but at large and generally—some great aspect of vital destiny, without losing the air of recording some accepted reality of human existence." (৬৪ পৃঃ)। মোট কথা, কোন বিশেষ "accepted reality of human existence" কে এমন গাম্ভীর্যের সঙ্গে এবং এমন ব্যাপক ও গভীর রূপে প্রকাশ করা চাই যাতে "some great aspect of vital destiny"র ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে।

এই প্রসঙ্গেই আসে—"রস"-বৈশিষ্ট্যের কথা। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে বলা হয়েছে—চারটি রস মহাকাব্যের প্রধান বা অঙ্গীরস হতে পারে [(১) শৃঙ্গার (২) বীর (৩) শান্ত এবং (৪) করুণ (টীকাকারদের মতে)] অর্থাৎ প্রত্যেক মহাকাব্যেই নানা রস বা ভাব থাকলেও একটি রসকে অঙ্গী-রূপে নিষ্পন্ন করতে হবে। এরিস্টটল এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং পরবর্তীকালে সেই সিদ্ধান্তের যে সমালোচনা হ'য়েছে তা' আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। দেখা গেছে—মহাকাব্যের রস সম্পর্কে প্রতীচ্যে খুব সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে উঠে নি। এরিস্টটলের মতে, ট্র্যাজেডির যে কয় প্রকার, মহাকাব্যেরও প্রকার সেই ক'টি—[ইলিয়াড করুণরসাত্মক (pathetic) এবং ethical (নীতিমূলক ?)]। যা-হোক বীর ও করুণ রসই যে মহাকাব্যের প্রধান রস—এই সিদ্ধান্তই মোটামুটি প্রতীচ্যের আলোচনা থেকে পাওয়া যায়।

শৃঙ্গার বা শান্ত রস অঙ্গীরস হতে পারে কিনা এ নিয়ে কোন প্রশ্ন বা আলোচনা সেখানে নেই। সুতরাং সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা এদের অঙ্গী বলে

ঘোষণা করে ভুল করেছেন কি না, অবশ্যই বিচার্য বিষয়। পূর্বেই বলা হয়েছে—'নায়ক' যেখানে ধীরোদাত্ত সেখানে লঘু ঘটনা বা লঘু ভাবাবেগের স্থান নেই। বীরের প্রেম (Love honour=heroic poem) অবশ্যই এমন তীব্র গভীরভাবে এবং ব্যাপক ঘটনা বিস্তারের সঙ্গে দেখানো যেতে পারে যাতে মহত্ত্ব-বোধ জেগে উঠতে পারে। বিশ্বগতির এবং মানব-নিয়তির পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে প্রেমকেন্দ্রিক জীবনদ্বন্দ্বকে বিরাট বিস্তারে রূপ দিতে পারলে, নিশ্চয়ই মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারে। "নৈষধ-চরিত"কে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মহাকাব্যের style (manner of conception+manner of composition) এসে গেলে, প্রেমের বিষয়ও মহাকাব্যের মহিমায় উন্নীত হ'তে পারে। আদিরস আশ্রয় করে জীবনের গভীর নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং বিরাট ঘটনা ঘটতে পারে—হোমারের অডিসি, ভার্জিলের এনিড প্রভৃতি মহাকাব্যই তার বড় প্রমাণ। পেনিলোপের পাতিব্রত্য, দিদোর ঐকান্তিক প্রেম ও প্রেমের জন্য আত্মবিলোপ অবশ্যই শৃঙ্গার রসাত্মক ব্যাপার। সুতরাং শৃঙ্গার যে অঙ্গীরস হ'তে পারে—এ সিদ্ধান্ত মিথ্যা নয়।

শান্তরসও যে মহাকাব্যের অঙ্গীরস হ'তে পারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য "মহাভারত" তার বড় প্রমাণ। সমস্ত যুদ্ধ কোলাহল, বাসনা-কামনার সংঘর্ষ, সংক্ষোভ অতিক্রম করে শান্তির সুমহান মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয়েছে। এত বড় পটভূমি এত তীব্র জীবন পিপাসা আর কোন্ মহাকাব্যে দেখা দিয়েছে? কুরুক্ষেত্র শুধু যুদ্ধক্ষেত্রই নয়, ধর্মক্ষেত্র। Great aspect of vital destiny মহাভারতে যেমন রূপ পেয়েছে, অন্যকোন মহাকাব্যে তেমন পায়নি। যা হোক, সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা অঙ্গীরস সম্পর্কে যে সূত্র বানিয়েছেন, তা এক হিসাবে যথেষ্ট বলা যায়। শৃঙ্গার-বীর-শান্ত-করুণ; এই চার রস বাদ গেলে বাকী থাকে (১) হাস্য (২) রৌদ্র (৩) ভয়ানক (৪) বীভৎস (৫) অদ্ভুত। বলা বাহুল্য—উল্লিখিত রসের অবলম্বন বিভাব হওয়া ধীরোদাত্ত নায়কের পক্ষে সম্ভব নয়। হাস্য, ক্রোধ, ভয়, ঘৃণা, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব সঞ্চারীভাব হিসাবে মহাকাব্যে থাকতে পারে বটে, কিন্তু "অঙ্গী" হওয়ার সামর্থ্য তাদের নেই। অবশ্য কেউ হয়ত বলতে পারেন—হাস্যরসাত্মক "মক এপিক" বলে একজাতের "মহাকাব্য" রচনা করা সম্ভব নয় কি?

সম্ভব হয়ত হয়, কিন্তু প্রকৃত মহাকাব্য হয় না। মহৎ ও বৃহৎ দুটো পৃথক কথা। মনে রাখা দরকার বৃহতের চেতনার সঙ্গে মহতের চেতনা মিলেই মহাকাব্যের রসবোধ সম্পূর্ণ হয়। শুধু বৃহৎ বা শুধু মহৎ নয়—একাধারে বৃহৎ মহতের মিলনেই মহাকাব্যের সৃষ্টি।

মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণে, বাংলার সাহিত্যশাস্ত্রীরাও এগিয়ে এসেছেন দেখা যায়। চিরাচরিত কথা বাদ দিলে যাঁদের আলোচনা অবশিষ্ট থাকে, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতির নাম সকলের আগে গণ্য। রবীন্দ্রনাথ-শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের "রামায়ণী কথার ভূমিকা স্বরূপে রচিত রামায়ণ" প্রবন্ধে মহাকাব্য বিষয়ে তাঁর নিজের ধারণা কি তা' ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি কাব্যকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করেছেন এবং একভাগে রেখেছেন সেই কাব্য যা "একলা কবির কথা" অন্যভাগে রেখেছেন সেই কাব্যকে যা "বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা"। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের নাম মহাকাব্য এবং কবির উপাধি মহাকবি—"যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি **সমগ্র দেশ** একটি **সমগ্র যুগ** আপনার **হৃদয়কে,** আপনার **অভিজ্ঞতাকে** ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।" রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাকাব্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় :—

(ক) সেই কাব্যই মহাকাব্য যা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।

(খ) "বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা" রচনা করতে হলে—রচনার ভেতর দিয়ে **একটি সমগ্র দেশ** একটি **সমগ্র যুগের হৃদয় ও অভিজ্ঞতাকে** প্রকাশ করা চাই।

(গ) মহাকাব্য সমস্ত দেশের "হৃদ্‌পদ্মসম্ভব"—বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতল জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়দান করে। মহাকবিরা 'আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করেন।'

(ঘ) মহাকাব্যের অন্যতম লক্ষণ "ব্যাপকতা"। মহাকাব্যের প্রচলিত ধারণাকে সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"বীররসপ্রধান কাব্যকেই 'এপিক' বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা। তাহার কারণ, যে দেশে, যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পাইয়াছে, সে দেশে সে কালে স্বভাবতই এপিক বীররস প্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও যুদ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছে,

রামের বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথাপি রামায়ণে যে রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা বীর রস নহে।"

এইবার রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তকে আরো একটু গুছিয়ে নেওয়া যাক।

(১) রবীন্দ্রনাথের মতে মহাকাব্য মাত্র চারখানি, গ্রীসের ২ খানা, ভারতবর্ষের ২ খানা। এই চারখানি ছাড়া আর সব নামেই মহাকাব্য।

(২) যে কাব্যে সমগ্র দেশের বা সমগ্র যুগের হৃদয় ও অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয় না—তা মহাকাব্য নয়। কারণ তা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা নয়—তার ব্যাপকতা নেই।

(৩) মহাকাব্যের বিষয় সার্বজনীন-আবেদন-সমর্থ হওয়া চাই অর্থাৎ যাতে দেশের বা যুগের হৃদয় ও অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়, সেই বিষয়ই মহাকাব্যের উপযুক্ত বিষয়।

(৪) বীররসপ্রধান কাব্যই মহাকাব্য—এ সিদ্ধান্ত সত্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত।

(ক) মহাকাব্যের জাতি লুপ্ত হয়ে গেছে।

(খ) খাঁটি মহাকাব্য—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, অডিসি।

(গ) আর সব নামেই অর্থাৎ অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য।

(রবীন্দ্রনাথের মতে লাইব্রেরীর সামগ্রী)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতে—অকৃত্রিম স্বাভাবিকতার যুগে মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং সে যুগ ফিরে না এলে আর মহাকাব্য জন্মাবে না। অকৃত্রিম স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের বিলক্ষণ লক্ষণ। পূর্বেই এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে এসেছি।

মেঘনাদবধ কাব্যের সম্পাদনা প্রসঙ্গে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়, মহাকাব্য-লক্ষণ নিরূপণের সমস্যাটির ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন। মহাকাব্যের নায়ক ও বিষয় গৌরব এবং আয়তন গৌরব—এই বিবিধ গৌরবকে একটি নামের অধীন করতে তথা মহাকাব্যের বিলক্ষণ রসটি নির্ধারণ করতে যে চেষ্টা করেছেন তা উল্লেখযোগ্য।

তার মতে—মহাকাব্যের বিলক্ষণ রস—বিশাল রস। "বিশাল রস" শব্দটি ডঃ সেনগুপ্তের উদ্ভাবনা। তবে এ রসের স্থায়িভাব "বিস্ময়" পুরাতন এবং সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আটটি স্থায়িভাবের অন্যতম। ডঃ সেনগুপ্তের বক্তব্য

এই যে বড়ো কিছুর দ্বারা যখন বিস্ময় উদ্রিক্ত হয় তখন বিশালরস নিষ্পন্ন হয়। "বড় কিছু" কথাটা খুব স্পষ্টার্থক নয়। "বড় কিছু" বলতে আকারে বড় বুঝায় কি প্রকারে বড় বুঝায়—স্পষ্ট করে তা বলা হয়নি। তারপর "বিশাল" শব্দটি আকৃতি গত বৃহত্ত্ব বোঝাতেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে—প্রকৃতি-গত গাম্ভীর্য বোঝাবার সামর্থ্য শব্দটির আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। এক সঙ্গে প্রকৃতিগত মহত্ত্ব এবং আকৃতিগত বিরাটত্ব বোঝায় এমন শব্দ আবশ্যক, বিশাল শব্দটির সেই সামর্থ্য আছে বলে মনে হয় না।

॥ ৪ ॥

মহাকাব্যের ধারা

ক। ইউরোপীয় মহাকাব্যের ধারা

ইউরোপের প্রাচীনতম মহাকাব্য এবং খাঁটি মহাকাব্য—ত্বখানি : ইলিয়াড এবং অডিসি। আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ পূঃ হোমার নামক জনৈক কবি এই মহাকাব্য ত্ব'খানি রচনা করেন। হোমারের পরিচয় যেটুকু পাওয়া যায় তা না পাওয়ারই সামিল। কোথায়, কবে, কার ঔরসে এবং কার গর্ভে তাঁর জন্ম, কি তাঁর শিক্ষা দীক্ষা এসব প্রশ্নের কোন উত্তরই কেউ জানেন না। অনুমান করা হয় যে তিনি চারণ কবি ছিলেন এবং নগরে নগরে তিনি নানা রকম গাথা শুনিয়ে বেড়াতেন। **ইলিয়াড** এবং **অডিসি** ঐ সব গাথারই (২৪ সর্গে) বিস্তারিত রূপ।

ট্রয় যুদ্ধের পটভূমিকায় কাব্য ত্বখানি রচিত। ট্রয়রাজ প্রায়ামের অন্যতম পুত্র প্যারিস গ্রীকরাজ এ্যাগামেমননের ভ্রাতা মেনেলাসের অসামান্যা সুন্দরী পত্নী হেলেনের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে হেলেনকে হরণ করেন এবং ট্রয়ে নিয়ে যান। গ্রীকরাজকুলের প্রতি অসম্মানের প্রতিকার করবার জন্য এ্যাগামেমনন সমস্ত অধীন রাজাদের সঙ্গে নিয়ে ট্রয় আক্রমণ করেন। গ্রীক বাহিনী নয় বৎসর ট্রয় অবরোধ করে ব'সে থাকে এবং ট্রয় উপকূলের নানা দেশ লুণ্ঠন করে। এইসব লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে গ্রীক সেনাপতি এ্যাগামেমনন এবং গ্রীকবীর একিলিসের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়; এবং শেষ পর্যন্ত একিলিস যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন এবং নিজ বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে স্থির হয়—প্যারিস ও মেনেলাসের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যুদ্ধের মীমাংসা হয়ে যাক। কিন্তু তা' হওয়ার আগেই ত্বই সেনাবাহিনীর সাক্ষাৎকার ঘটে। গ্রীক বাহিনী পরাজিত হয়ে সরে আসতে বাধ্য হয়। ট্রয় সেনাপতি হেকটর গ্রীকদের রক্ষাবেষ্টনী ভেঙ্গে ফেলে একখানি গ্রীক জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেন। এই ঘটনায় একিলিস বিচলিত হন এবং তাঁর অনুরক্ত প্রিয় বন্ধু পেট্রোক্লাসের অধিনায়কত্বে নিজ বাহিনীকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন। পেট্রোক্লাস ট্রয় বাহিনীকে ট্রয়ের প্রাচীর পর্যন্ত হটিয়ে নিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত

হেকটরের হস্তে নিহত হন। পেট্রোক্লাসের মৃত্যুতে একিলিস শোকে ক্ষিপ্ত হয়ে যান—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এ্যাগামেমননের সঙ্গে এসে যোগ দেন এবং হেকটরকে বধ করে প্রতিহিংসার জ্বালায় হেকটরের শবটিকে রথের চাকায় বেঁধে রণক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করেন। শেষ পর্যন্ত হেকটরের বৃদ্ধ পিতা প্রায়াম এসে একিলিসের কাছে শব প্রার্থনা করেন। একিলিস প্রার্থনা পূর্ণ করেন এবং উভয় পক্ষ শবদাহের জন্য যুদ্ধবিরতির একটি সন্ধি করেন। ইলিয়াড কাব্যে হোমার এই কাহিনী—একিলিসের বিবাদ, ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞা থেকে হেকটর বধ ও তার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্যন্ত ঘটনারাজি—বর্ণনা করেছেন।

এই মহাকাব্যখানি রসমুখ্য রচনা। প্রধানতঃ ট্র্যাজেডি রসের দিকে লক্ষ্য রেখেই হোমার ইলিয়াড রচনা করেছেন। এর কেন্দ্রে নৈতিক বা মহৎ আদর্শের জন্য সচেতন কোন দ্বন্দ্ব নেই বলেই এরিস্টটল ইলিয়াডকে 'ট্র্যাজিক' এবং অডিসিকে 'এথিকাল' ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। চব্বিশ সর্গে বিস্তারিত এই কাহিনীর বিরাটত্ব যেমন অবশ্যস্বীকার্য তেমনি স্বীকার্য এর বর্ণনীয় জীবনের প্রাণাবেগের তীব্রতা—ভাবাবেগের গভীরতা।

ইলিয়াড যেমন ট্রয় যুদ্ধের শেষ পর্বের কাহিনী, **অডিসি** তেমনি ট্রয়-যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনার বর্ণনা—প্রত্যাবর্তনকালে গ্রাকবীর অডিসিউসের যে বিপত্তি এবং শেষপর্যন্ত যেভাবে বিপন্মুক্তি ঘটেছিল সেই সব ঘটনা অবলম্বনে রচিত কাহিনী। এই কাব্যখানিও ২৪ সর্গে (বুক) বিভক্ত। এই কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ঃ—যুদ্ধান্তে জীবিত সমস্ত সেনাপতি এবং সৈন্য নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে এসেছেন। ফিরতে পারেননি একমাত্র অডিসিউস। দেবতা এটলাসের কন্যা ক্যালিপ্‌সো (Calypso) তাঁকে তার গুহাগহ্বরে বন্দী করে রেখেছে—এবং তাকে বিবাহ করবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। দেবতাদের মধ্যে অডিসিউসের বিপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়। জিউস কন্যা আথিনী অডিসিউসকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টিত হন। দেবদূত হারমিসকে পাঠানো হয় ক্যালিপ্‌সোর কাছে এবং তিনি নিজে যান ইথাকায়—অডিসিউসের পুত্র 'টেলিমেকাস'কে পিতার সংবাদ সংগ্রহে তৎপর করে তুলবার জন্য। টেলিমেকাস তৎপর হন—ইথাকার অধিবাসীদের সম্মেলন আহ্বান করে কর্তব্য নির্ধারণের চেষ্টা করেন। এদিকে আগেই এক নতুন উৎপাত দেখা দিয়েছে। অডিসিউসের দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতির সুযোগে ইথাকার বহুলোক

সুন্দরী পেনিলোপীর পাণিপ্রার্থী হয়েছে। তাঁদের অনুনয় উপদ্রবে পেনিলোপী অস্থির এবং বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। সে যাইহোক, টেলিমেকাস পিতার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে খোঁজ খবর নিতে থাকেন। বিজ্ঞ নেষ্টরের সঙ্গে দেখা ক'রে—মেনেলাস ও হেলেনের সঙ্গে দেখা করেন। ওদিকে হারমিস যেয়ে ক্যালিপ্সোকে জিউজের আদেশ ও ইচ্ছা জানাতেই, জিউজের রোষের ভয়ে ক্যালিপসো অডিসিউসকে মুক্ত করে দেন এবং দেশে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন।

কিন্তু যে পোসিডনের আক্রোশে অডিসিউসের এত বিড়ম্বনা, সেই পোসিডন আবার তাঁকে বিপদগ্রস্ত করেন—ঝড় তুফানের ধাক্কায় দুঃখদুর্দশার একশেষ করেন। তবে দৈব অনুগ্রহের জোর থাকায় প্রাণহানি হয় না। ভাসতে ভাসতে তিনি ফেইয়াসিয়ানদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হন। ঐ দেশের রাজকন্যা নৌসিকা তাকে আশ্রয় দিয়ে পিতা অলসিনৌসের কাছে নিয়ে যান। রাজা তাঁকে আশ্রয় দেন এবং ইথাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। নানা দেশ ঘুরে অডিসিউস ইথাকায় পদার্পণ করেন এবং এক শূকর পালকের ঘরে আশ্রয় নেন। এর মুখেই তিনি সমাগত পাণিপ্রার্থীদের দৌরাত্ম্যের কথা জানতে পারেন এবং এরই গৃহে পুত্রের সঙ্গে অডিসিউসের সাক্ষাৎকার ঘটে। অডিসিউস প্রথমে আত্মপরিচয় গোপন করে থাকেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুত্রের কাছে পরিচয় ব্যক্ত করেন, কিন্তু তাঁর কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখতে বলেন। টেলিমেকাস রাজধানীতে চ'লে যান এবং অডিসিউস ভিক্ষুকবেশে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন এবং আশ্রয় লাভ করেন। শেষ পর্যন্ত পাণিপ্রার্থীদের তিনি পরাজিত ও বিতাড়িত করেন এবং পত্নী পেনিলোপীর সঙ্গে মিলিত হন।

এই মহাকাব্যখানিকে এরিস্টটল বলেছিলেন—'এথিকাল'। কারণ এতে পেনিলোপীর ও অডিসিউসের প্রেমনিষ্ঠাকে নানা পরীক্ষার ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ইলিয়াডের উপসংহার—বিয়োগান্তক, অডিসির উপসংহার—মিলনান্তক। অনুবাদক E. V. Rien লিখেছেন, ইলিয়াড হচ্ছে—ট্র্যাজেডির এবং অডিসি নভেলের গোত্র-পুরুষ।

তৃতীয় মহাকাব্য এবং প্রথম "লিটারারি এপিক"—**ভার্জিল**-রচিত **"এনিড"**। এই মহাকাব্য খানি বারটি সর্গে (বুক) বিভক্ত। প্রথম সর্গে—

এইনিয়াসের কার্থেজে আগমন, দ্বিতীয় সর্গে—ট্রয় ধ্বংসের কাহিনী, তৃতীয় সর্গে—সপ্তবর্ষব্যাপী ভ্রমণ, চতুর্থ সর্গে—দিদোর প্রেম ও তার পরিণাম, পঞ্চম সর্গে—পোতশ্রেণীর ক্রীড়া, ষষ্ঠ সর্গে—প্রেতলোক দর্শন, সপ্তম সর্গে—লাতিয়ুমে অবতরণ এবং ইতালীয় সেনাবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ, অষ্টম সর্গে—রাজা ইভান্দারের কাছে দূত প্রেরণ, নবম সর্গে—ট্রোজান শিবিরের অবরোধ, দশম সর্গে—বেলাভূমিতে যুদ্ধ, একাদশ সর্গে—লাতিনদের সভা এবং কেমিল্লার জীবন ও মৃত্যু এবং দ্বাদশ সর্গে—তুরন্থসের হত্যা। ট্রয়বীর এইনিয়াস ট্রয়ধ্বংসের পরে, অবশিষ্ট লোকজন নিয়ে লাতিয়ুম অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর অভিলাষ—নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। জুনোর চক্রান্তে তাঁর যাত্রা বিঘ্নিত হয়—কার্থেজে আশ্রয় নিতে তিনি বাধ্য হন। এখানেই দিদোর সঙ্গে তার দেখা হয়। দিদো এইনিয়াসকে দেখে মুগ্ধ হন এবং ঐকান্তিক আবেগে ভালবাসেন। দু'জনে সম্ভোগে প্রমত্ত হয়ে কালাতিপাত করেন। এমন সময় জুপিটার পুত্র মার্কারিকে পাঠিয়ে এইনিয়াসকে তাঁর সংকল্প স্মরণ করিয়ে দেন। এইনিয়াস রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। তাঁর মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একদিকে দিদোর প্রেম, অন্যদিকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প। শেষ পর্যন্ত সংকল্পই জয়ী হয়—তিনি জাহাজ প্রস্তুত করবার আদেশ দেন। দিদোর কাতর অনুনয়ে এবং তার মর্মদাহ দেখে তিনি ব্যথিত হন, কিন্তু সংকল্প ত্যাগ করেন না—মূর্চ্ছিত দিদোকে পেছনে রেখে জাহাজে গিয়ে ওঠেন। দিদোর কাতর ক্রন্দন তার গতিপথে বাধা স্থষ্টি করতে পারে না। দিদো তার ভগিনীকে চিতা প্রস্তুত করতে বলে আত্মহত্যা করেন। তারপর সমুদ্রের অনেক ঝড় ঝাপটার বাধা ঠেলে এইনিয়াস 'ইউবোয়িককুমেই' উপকূলে পৌঁছান এবং সেখানকার মন্দিরের পুরোহিতের কৃপায়—প্রেতলোকে গিয়ে ট্রয়ের মৃতবীরদের এবং পিতার সঙ্গে দেখা করেন এবং দিদোকেও দেখেন।

এই পর্বের পরে এইনিয়াসের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়—এইনিয়াস সদলবলে 'লাতিয়ূমে' অবতরণ করেন। রাজা লেটিনাস তাদের ডেকে পাঠান; তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং ট্রয়-সন্তানদের আশ্রয় দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি এইনিয়াসকে দেখতে চান; কারণ দৈববাণী অনুসারে কোন আগন্তুক বীরই তাঁর কন্যার স্বামী হবে। রাজার এই অভিপ্রায় শুনে কন্যার পাণিপ্রার্থী বীর 'তুরন্থস' মর্মাহত হন। জুনো ছদ্মবেশে

তুরহুসকে যুদ্ধ করতে উত্তেজিত করেন এবং তুরহুস সৈন্যদের উত্তেজিত করে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বীরাঙ্গনা কেমিল্লাও যুদ্ধে যোগদান করেন। বেলাভূমিতে দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। প্রতিপক্ষকে পরাজিত ক'রে এইনিয়াস—রাজকন্যা লেভিনিয়াকে লাভ করেন। এখানেই 'এনিড' মহাকাব্যের সমাপ্তি।

এই মহাকাব্যের বাইরের উদ্দেশ্য—"Song of Rome's Imperial Destiny" রচনা করাই হোক আর যাই হোক, ভেতরের উদ্দেশ্য—মানুষের জীবনে প্রেয়ের উপরে শ্রেয়ের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করা—জাতির শুভাশুভকে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার আদর্শকে বড় করে তোলা। ভার্জিলের (৭০ খ্রীঃ পূঃ—১৯ খ্রীঃ পূঃ) কাব্য কোন যুগেই উপেক্ষিত হয়নি—এমন কি অন্ধকার যুগেও ভার্জিল পঠিত ও সমাদৃত হয়েছেন। তাঁর কাব্য পরবর্তী মহাকবিদের উপরে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' মহাকাব্যে এনিড মহাকাব্যের ষষ্ঠ সর্গের প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায় এবং 'ক্যানজোন দ্য রোলাণ্ড'—কাব্যেও যে এনিডের প্রভাব পড়েছে এ কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন।

ভার্জিলের 'এনিড'-এর পরে লুকান-রচিত—**"ফারসালিয়া"-র** (Bellum Civile) উল্লেখ করা যেতে পারে। লুকানের পিতা অল্পবয়সেই লুকানকে রোমে নিয়ে আসেন এবং রোমেই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা হয়। পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি এথেন্স যান। কিন্তু নেরো তাঁকে এথেন্স থেকে ফিরিয়ে এনে পারিষদ-সভায় স্থান দেন। কিন্তু নেরোর অপ্রীতিভাজন হ'তে বেশী সময় লাগে না। নেরোর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয় লুকান তাতে যোগ দেন। সে কথা ব্যক্ত হয়ে যাওয়ায় লুকান আত্মহত্যা করে অব্যাহতি পান।

লুকানের একমাত্র সাহিত্যকীর্তি—অসম্পূর্ণ "বেল্লাম সিভিলি" বা ফাসালিয়া। দশ সর্গে বিভক্ত এই কাব্যখানিতে লুকান পোম্পে এবং সিজারের যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে লুকান কোন পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করেননি, ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়েই তিনি মহাকাব্য লেখার চেষ্টা করেছেন, এবং ঘটনা নিয়ন্ত্রণে দেবদেবীর হস্তক্ষেপ বর্জন করেছেন। লুকান তাঁর কাব্যে রিপাবলিকের আদর্শকে উচ্চে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

লুকান-রচিত "ফার্সালিয়া"র পরে—এ্যাংলো-স্যাকশান মহাকাব্য —"বিওউলফ" (Beowulf) উল্লেখযোগ্য। এই কাব্যের রচনাকাল ৮ম শতাব্দী। রচয়িতার নাম এবং রচনার ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়—পৌরাণিক বীর বিওউলফের জীবনের দুইটি প্রধান ঘটনা। প্রথম ঘটনা—দানব গ্রেণ্ডেল এবং গ্রেণ্ডেলের মাকে হত্যা করা; এই দানব দানবী নরবেশে ডেনিশ রাজ হ্রথগারের রাজ্যে উৎপাত ক'রছিল। বীর বিওউলফ এই দানব-দানবীকে হত্যা করেন। দ্বিতীয় ঘটনা—বহুকাল রাজত্ব করার পরে ঘটেছিল। একটি ড্রেগন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য 'গিয়েটিশ' (Geatish) জনসাধারণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। গিয়েটিশ-বীর বিওউলফ তাঁর আত্মীয় উইগলেফের সাহায্যে ঐ ড্রেগনকে হত্যা করেন—কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত হন। এই দুই ঘটনাকে একব্যক্তিসূত্রে গ্রথিত করে বিওউলফ মহাকাব্য—রচনা করা হয়েছে। যদিও এই কাব্যখানি মহাকাব্য ব'লেই পরিচিত, তবু কেউ কেউ একে মহাকাব্যের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন।

'বিওউলফ'—কাব্যের পরে—দ্বাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদেশে, The'roulde —নামক জনৈক কবি 'তুরোলদাস' (Turoldus) নাম নিয়ে—"ক্যানজোন দ্য রোলাণ্ড" ("Chanson de Roland") রচনা করেন। এই কাব্যটি, 'Chanson de Geste'—নামক কাব্য-সংগ্রহের (৭০, ৮০টি সংক্ষিপ্ত কাব্যের সমষ্টি) অন্যতম এবং প্রাচীনতম।

একাদশ শতাব্দীর শেষে এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইউরোপের খ্রীষ্টানদের মধ্যে জেহাদের প্রবৃত্তি খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল। বিধর্মীদের বিনাশে এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রসারে আত্মনিয়োগ সবচেয়ে পুণ্য কর্ম ব'লে বিবেচিত হয়েছিল। ধর্মের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন যাঁরা তাঁদের কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করার তথা জনগণকে ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার ঐকান্তিক আবেগ দেখা দিয়েছিল। ধর্মযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণাতেই শার্লামেন-কাহিনী অবলম্বনে—'ক্যানজোন দ্য রোলাণ্ড' মহাকাব্য (১১০০) রচিত হয়েছিল। এই কাব্যে শার্লামেনের ভ্রাতুষ্পুত্র রোলাণ্ডের বীরত্ব—'Roncesvallis' রক্ষা করতে কি করে রোলাণ্ড এবং তাঁর সহযোগী অলিভার

সেরাসেনদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিল এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছিল সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে—রোলাণ্ডের মৃত্যুর পর প্রতিহিংসাপরায়ণ শার্লামেনের রণক্ষেত্রে প্রবেশ এবং শত্রুদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যার কাহিনী। এই কাব্য সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক (কোহেন) লিখেছেন—এই কাব্য যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা, মান, আনুগত্য, এবং অমানুষিক ধৈর্যশীলতার কাহিনী।

শার্লামেন কাহিনী নিয়ে এবং অন্যান্য বীরদের বীরত্ব কাহিনী নিয়ে আগে অনেক রোমান্টিক মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। এই সব বীরদের মধ্যে—Guillaume—অন্যতম। তার জীবন নিয়েও একাধিক মহাকাব্য রচিত হয়েছে।

এই ধরনেরই মহাকাব্যজাতীয় কাব্য পাওয়া গেছে—আইসল্যাণ্ডে। সপ্তদশ শতাব্দীর সমালোচকরা নাম দিয়েছেন—এলডার বা সেইমুণ্ডের এড্ডা। আইসল্যাণ্ডের প্রাচীনতম দেবদেবীদের এবং বীরদের কাহিনী। পণ্ডিতদের ধারণা—সেইমুণ্ড (Saemund) এই কাব্য রচনা অথবা সংকলন করেছেন (১১৩৩)। তবে জোর করে কিছুই বলা চলে না। কবে এবং কে এই কাব্য রচনা করেছেন, তা জানবার উপায় নেই। এর প্রাচীন অংশ নবম শতাব্দীতে রচিত এমন অনুমানও করা যেতে পারে। অবশ্য এই সব কাহিনীর ভিত্তি হয়ত আরো অতীতের—চতুর্থ শতাব্দীর গাথা—যা পরবর্তী কালে জার্মান মহাকাব্য 'নিবেলুঙ্গেনলাইড'-এ পরিবর্ধিত আকারে দেখা দিয়েছে। লোকের মুখে মুখেই 'এড্ডার কাহিনী' বংশপরম্পরাক্রমে চলে এসেছে এবং দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে প্রথম লিখিতরূপ পেয়েছে। সে যাই হো'ক—এই ধরনের কাহিনী সংগ্রহকে যে মহাকাব্যের মর্যাদা দেওয়া উচিত নয়, হোমারের ইলিয়াড, অডিসি এবং ভার্জিলের এনিড এর মর্যাদার কথা চিন্তা করলেই তা বুঝা যাবে। এই সব কাব্যকে আখ্যায়িকা বললেই ঠিক বলা হয়।

অতএব 'ক্যানজোন দ্য রোলাণ্ডে'র পরে স্পেনদেশীয়—এল ক্যানটার ডি মিও চিড (El Cantar di mio Cid"—কে আমরা মহাকাব্যের পংক্তিতে স্থান দিতে পারি। ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যখানি রচিত।

এর নায়ক 'চিড্' (Cid) কোন পৌরাণিক বীর ন ন। রচনাকালের চল্লিশ বৎসর আগেই তিনি জীবিত ছিলেন। সুতরাং নায়ক অতি নিকট

কালেরই লোক বলে ঘটনায় এবং বর্ণনায় অতিকাল্পনিকতা এবং অতিরঞ্জন প্রবেশ করতে পারে নি। চিডের চরিত্রে আমরা বীর সৈনিকের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যতটা দেখতে পাই ততটা আনুগত্য বা নিষ্কাম বীরত্ব দেখানোর প্রবৃত্তি দেখতে পাইনে। চিড্‌ও মুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন বটে কিন্তু ধর্মের পতাকা স্কন্ধে করে শত্রু নিপাত করতে যাননি। গেছেন ধন ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করার জন্য। তারপর কাব্যখানি তেমন সুগঠিতও নয়। কাহিনী দুটি পর্বে বিভক্ত হ'য়ে গেছে—প্রথম পর্বে—চিডের নির্বাসন, অভিযান, পুনর্বাসন এবং ক্যারিয়োনের রাজপুত্রদের সঙ্গে কন্যাদের বিবাহ সম্বন্ধ—বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বে বর্ণিত হয়েছে—রাজপুত্রদের হাতে কন্যাদের অপমান এবং কন্যাদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে 'চিডে'র রাজপুত্রদের সঙ্গে বিরোধ। বলা বাহুল্য কাব্যের গঠনে কোন অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ বা ঐক্য নেই এবং চরিত্রগুলির মধ্যে কোন অতিমানবিক ভাবনিষ্ঠা প্রকাশ পায়নি। হোমারের এবং ভার্জিলের সঙ্গে তুলনা করলে এই কাব্যকে মহাকাব্য না বলে মহাকাব্য-জাতীয়ই ব'লতে হ'বে। জে এম কোহেন এই কাব্যের কবি সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন তা' দিয়েই উপসংহার করছি—"Worldly success, in fact, together with humour and tough endurance, is the highest quality envisaged by the poem's author'.—(*A History of Western Literature*)। জার্মানীতেও দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই জাতীয় একাধিক এপিক রচিত হয়েছিল। হার্টম্যান ফন এউয়ে, প্রথম (Hatman Von Aue—1170-1215) 'হতভাগ্য হেনরী' নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। উলফ্রাম ফন্ এশেনবাক রচিত "পারজিভাল" (Parzival) এবং গটফ্রিড ফন্ স্ট্রাসবুর্গ রচিত "ট্রিস্তান" (Tristan) ফরাসী কাব্যের ভিত্তিতে রচিত আর দুখানি কাব্যও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য মহাকাব্যের পংক্তিতে এদের কোন বিশিষ্ট স্থান নেই। সেই স্থান অধিকার করে আছে অজ্ঞাতনামা লেখকের লেখা—নিবেলুঙ্গেনলাইড (Nibelungenlied)। এখানিও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত। পৌরাণিক ব্রুণহিলড্, সিগফ্রিড্ আখ্যান এবং রাইন-নদীর তীরবর্তী বার্গাণ্ডিয়ানদের ইতিহাস মিশিয়ে কবি এই কাব্য রচনা করেছেন। সিগফ্রিডের বীরত্বগাথাই এই কাব্যের উপজীব্য। এর নায়ক যেমন অসামান্য

বীর, এর নায়িকাও তেমনি অসামান্যা। সিগফ্রিডেকে হত্যা করার পরে তার প্রণয়িনী ক্রাইমহিলড (Kriemhild) প্রতিহিংসা নেবার জন্য এমন উন্মত্ত হ'য়েছেন যে—শত্রুমিত্র সকলকেই—এমন কি নিজের পুত্রকেও রক্তের আবর্তে ডুবিয়ে মেরেছেন। সিগফ্রিডের জন্য শেষে যে শোকগাথা দেওয়া হয়েছে তাকে প্রাচীন গাথারই লুপ্তাবশেষ ব'লে মনে করা হ'য়েছে। এই কাব্যে বীররসকে কবি ট্র্যাজেডির মূর্ছনায় মণ্ডিত করেছেন।

পূর্বোক্ত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের স্পেনের এবং জার্মানীর মহাকাব্য সম্বন্ধে আমাদের মনে তেমন সম্ভ্রমবোধ না থাকলেও, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ইতালীতে যে মহাকাব্যের অভ্যুদয় ঘটতে দেখি তা' আমাদের মনে প্রকৃত মহাকাব্যের রস জাগিয়ে দেয়। এই মহাকাব্য যিনি রচনা করেছেন তাঁর নাম—'দান্তে এলিঘিয়েরি (১২৬৫-১৩২১) এবং মহাকাব্যখানির নাম "ডিভাইনা কমেডিয়া" (১৩০৭-১০ খ্রীঃ)। তিনটি পর্বে কাব্যখানি বিভক্ত—প্রথম পর্বে ৩৪ ক্যাণ্টো, দ্বিতীয় পর্বে ৩৩ ক্যাণ্টো এবং তৃতীয় পর্বে ৩৩ ক্যাণ্টো। মোট শত ক্যাণ্টো। প্রথম পর্বে "হেল্ (Hell), দ্বিতীয় পর্বে—"পারগেটরি" (Purgatory) এবং তৃতীয় পর্বে—(Paradise) বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাব্যের মূল বর্ণনীয় বিষয়—মানবাত্মার স্বর্গাভিমুখী অভিসার—মৃত্যুর পরে পাপপুণ্য অনুসারে আত্মার গতি। এই বিষয়বস্তু মূলতঃ মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকেই গৃহীত হয়েছে, যদিও তার সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের তত্ত্বও সংযুক্ত হয়েছে। দান্তের যুগে কাব্যে দু'টি প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছিল—একটি—নিষ্কামপ্রেমের মহিমা প্রচার, অন্যটি—রূপকাকারে ধর্মনীতি প্রচার। এই দুই প্রবৃত্তির সঙ্গে অগ্রজ কবি গুইদো কোভালকান্তির প্রচারিত প্লেটোনিক আইডিয়ার সংস্কার মিশে দান্তের কবিমানসের বিশেষ ঝোঁকটি তৈরি হ'য়েছিল। 'ডিভাইন কমেডিয়া'—মহাকাব্য সেই কবিমানসেরই সৃষ্টি। ডিভাইনা কমেডি একদিকে কবির এক 'দিবাস্বপ্ন', অন্যদিকে রূপক—"Vision and allegory"। এই কাব্যে কবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনেরই বাসনা-কামনালুব্ধ মনের দাহ অনুশোচনা এবং নবলব্ধ দার্শনিক উপলব্ধিজাত প্রশান্তির আনন্দকে, 'হেল' 'পারগেটরি' এবং প্যারাডাইজের দৃশ্যে রূপকায়িত করেছেন। নরকের স্তরে স্তরে তিনি যাদের দেখেছেন তাঁরা জৈবিক কামনার উর্ধ্বে জীবনের কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পায়নি—বাসনা-কামনার আগুনে দগ্ধ হয়েই তাঁরা জীবন শেষ করেছেন।

'পারগেটরি'তে যাদের সঙ্গে (শিল্পীদের) দেখা হ'য়েছে তাঁরা নিছক জৈবিক কামনাময় জীবন যাপন না করলেও, অহংকার, বা মদগর্ব ত্যাগ করতে পারেন নি। স্বর্গে স্থান পেয়েছেন তাঁরাই যাঁরা খ্রীষ্টধর্মকে রক্ষা করতে নিষ্কামভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন—ভগবানের ধ্যানে চিত্তকে সমাহিত করেছেন। কবি দেখিয়েছেন বিষয়াসক্তি বা কামনাই নরক ; আসক্তির ত্যাগে, নিষ্কাম ধর্ম কর্মে এবং ঈশ্বরোপাসনাতেই স্বর্গ। ডিভাইন কমেডি এই হিসাবে প্রবৃত্তির নরক থেকে নিবৃত্তির স্বর্গে মানুষকে নিয়ে যাওয়ার—মহাকাব্য। প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে, অন্ধের মতো বিষয়ের কামনায় ছুটোছুটি ক'রে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে—যা'পায় তা'তে তার তৃপ্তি হয় না—কামনার শান্তি হয় না। প্রজ্ঞালোকে দৃষ্টি স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত প্রবৃত্তির ঘোর কাটতে চায় না। প্রবৃত্তি এত প্রবলা যে বিষয়ৈষণা প্রশমিত হ'লেও অহংকারটুকু যেতে চায় না। অহংকার থাকা পর্যন্ত কামনার জড় মরে না। অহংকার মরলেই তবে নিষ্কাম হওয়া সম্ভব এবং নিষ্কাম হ'লেই সত্য ও শান্তিকে পাওয়া যায়—ভগবৎ সেবার অপার আনন্দ লাভ করা যায়। এই তত্ত্বটিকেই মহাকবি দান্তে রূপকাকারে 'ডিভাইনা কমেডিয়াতে' ব্যক্ত করেছেন। এই কারণেই কাব্যখানি একাধারে "Vision and an allegory" হয়েছ।

দান্তের পরে—রেনেসঁা-যুগের প্রথম মহাকবি এরিয়োষ্টো (Ariosto)। তাঁর কাব্যের নাব "ওরল্যাণ্ডো ফিউরিয়োছো" (Orlando Furioso) (১৫১৬)। যদিও কাব্যখানি মহাকাব্যের আকারে রচিত, তবু পণ্ডিতদের অনেকেই একে মহাকাব্যের মর্যাদা দেননি ; 'রোমান্স'-জাতীয় রচনা বলেই গণ্য করেছেন। অবশ্য এরিয়োষ্টোর আগে কবি বৈয়ার্দো (Boiardo) 'ওর্ল্যাণ্ডো'কে নায়ক ক'রেই 'ওর্ল্যাণ্ডো ইম্‌মেমোরাতো' (Orlando Immemorato) নামে একখানি মহাকাব্য লিখ্‌তে চেষ্টা করেছিলেন, তবে কাব্যখানি তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। এরিয়োষ্টো বৈয়ার্দোর ইচ্ছাকেই 'অনুবর্তন' ক'রে "ওর্ল্যাণ্ডো ফিউরিয়োছো" কাব্য রচনা করেন। কিন্তু মহাকাব্যের ভাব ও ভাষার যে গাম্ভীর্য থাকা উচিত এ কাব্যে তা নেই ব'লেই কাব্যখানির তেমন গুরুত্ব নেই।

এরই কিছু আগে পোপ লিও (দশম) মার্কো গিরোলামো ভিদাকে (১৪৮০-১৫৬৬) দিয়ে খ্রীষ্টের জীবন অবলম্বনে লাতিন ভাষায় ভার্জিলের মতো

একখানি মহাকাব্য (Christiad) লিখিয়েছিলেন। ভিদার মহাকাব্যের আর কোন প্রভাব থাক না থাক, পরবর্তী এই জাতীয় মহাকাব্য রচনায় তিনি পথিকৃতের কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। সমালোচকেরা দেখেছেন মিলটনের উপরে ভিদার প্রভাব সামান্য হ'লেও লক্ষণীয়।

ভিদাকে অনুসরণ করে ভার্জিল অনুকরণে যিনি উল্লেখযোগ্য একখানি মহাকাব্য রচনা করেন, তিনি হচ্ছেন লুইস্ ডি কামোয়েস্ (Luis de Camoes)। তাঁর কাব্যের নাম—"Os Lusiadas" (লুসাসের পুত্রগণ) (১৫৭০)। স্বদেশ পর্তুগাল থেকে নির্বাসিত হয়ে কামোয়েস্ ভারতের এবং চীনের উপকূলে আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছেন এবং যেখানেই গেছেন লাতিন সংস্কৃতি প্রচার করেছেন। তাঁর কাব্যের নায়ক—'ভাস্কো ডা গামা'। গামার মধ্যে তিনি এইনিয়াসের আত্মাকে সঞ্চার করেছেন। ভাস্কো ডা গামার সমুদ্রযাত্রার মধ্যে তিনি পর্তুগালের তথা লাতিন সংস্কৃতির বিজয় অভিযান দেখতে পেয়েছেন—তাঁর চোখে পর্তুগাল অতীত লাতিন ঐতিহ্যের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন মহাকাব্যের সব কিছুই তিনি আমদানী করেছেন। দেব-দেবী-বন্দনা দেব-দেবীদের বিতর্ক, ঘটনা-নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সব কিছুই আছে এবং সকলের উপরে আছে পর্তুগালের গৌরবপূর্ণ ইতিহাস—বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পর্তুগালের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী।

আর একজন কবি—Alonso de Ercilla (১৫৩৩-৯৪) 'স্পেনের চিলিবিজয়' ঘটনাকে অবলম্বন করে 'La Araucana (১৫৬৯) নামে একখানি মহাকাব্য লেখেন। কবি নিজেই এই বিজয় অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং অতিবাস্তবতার সঙ্গে আরুকেনিয়ান ইণ্ডিয়ানদের স্বদেশরক্ষার সংগ্রামকে বর্ণনা করেছেন। 'আরুকেনিয়ান'দের প্রধান কপোলিকান (Caupolican) তিরিশ বছর ধরে স্পেন-সৈন্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছেন—বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। তাঁর অতুলনীয় বীরত্বের কাছে স্পেনের বীররা নিষ্প্রভ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বীর যোদ্ধাকে স্পেনের বীররা অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হত্যা করেছে এবং স্পেনের তথা খ্রীষ্টধর্মের পতাকা চিলিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কবি ভার্জিলীয় রীতিতে মহাকাব্যখানি রচনা করেছেন এবং এরিয়োষ্টোর রোমান্টিক রীতি পরিহার করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কাব্যখানির জন্ম বলে এর মধ্যে উৎকল্পনা বা কৃত্রিমতা প্রবেশ করতে পারেনি।

পরবর্তী মহাকাব্য এবং রোমান্টিক মহাকাব্য রিণাল্ডো এবং জেরুজালেম লিবারেটা (Gerusalemme Liberata) (১৫৭৫ খ্রীঃ)। এই মহাকাব্যের কবি ফেরারার সভাকবি কবিপুত্র টোরকোয়াটো ট্যাসো (১৫৪৪-৯৫)। ট্যাসো রোমান্টিক এবং ক্লাসিকাল রীতির সমন্বয় করতে অর্থাৎ রোমান্সের বহুবিসর্পিত কাহিনীকে তিনি একটি সংহত এবং ঐক্যযুক্ত কাহিনীতে পরিণত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি একটি ব্যক্তির জীবন স্থত্রে বিভিন্ন ঘটনা গেঁথে কাব্যহার রচনা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় এবং প্রধান কাব্যের বিষয়বস্তু—ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড) মুসলমানদের অধিকার থেকে জেরুজালেমকে উদ্ধার করবার জন্য খ্রীষ্টভক্ত ইউরোপীয় রাজাদের সংগ্রাম। বলা বাহুল্য—বিষয়বস্তু একটু দূরবর্তী অতীতের ঘটনা এবং কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কারণেই, তাঁর কাব্যে—যুদ্ধের কাব্যে—অনেক আজগুবি ঘটনা এবং কল্পনাতিশয্য প্রবেশ করেছে। মূলতঃ ট্যাসো প্রেমের কবি, ক্যামোয়েসের মতো যুদ্ধের কবি ন'ন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা আর একবার মহাকাব্যের প্রকৃত রস নতুন ক'রে—আস্বাদন করতে পারি। মিলটনের "প্যারাডাইস লষ্ট" (১৬৬৭) মহাকাব্যখানি সেই রসের আধার। দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়াতে' আমরা দেখেছি—কবির একটি স্বপ্ন (vision) খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের রূপক হয়ে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ ক'রেছে, লৌকিক ঘটনার (পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক ঘটনা) বর্ণনা থেকে মহাকাব্য স'রে গেছে—ভাবাদর্শ (আইডিয়া) মহাকাব্যের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মিলটনে এসে আমরা আবার সেই প্রবৃত্তিটি লক্ষ্য করতে পারি। অবশ্য মিলটন যে বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন তা দান্তের বিষয়বস্তুর মতো visionary এবং allegorical নয়, তা অনেকপরিমাণে কাহিনীর স্থূক্ষ্ম শরীরে বর্তমান।

মিলটন বাইবেলের একটি কাহিনীকে আদম ইভের অর্থাৎ মানুষের স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার কাহিনীকে মহাকাব্যের বিস্তার এবং রসগাম্ভীর্য দান করেছেন। দান্তের কাব্যে আমরা ভিন্ন কল্পনায় প্রায় একই বিষয়বস্তুকে রূপকাকারে পেয়েছি—হেল থেকে পারগেটরির ভেতর দিয়ে প্যারাডাইসে পৌঁছানোই যে পতিত মানুষের মুক্তির পথ সেই কথাই দান্তে বলতে চেয়েছেন। মহাকবি মিলটন শয়তানের চক্রান্তে আদিম নর আদম এবং আদিম নারী ইভের পতন কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং 'প্যারাডাইস রিগেইন্ড্'-এ স্বর্গে ফিরে

যাওয়ার উপায় নির্দেশ করেছেন। দান্তে এবং মিলটন উভয়েই খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের কবি এবং উভয়েই উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনার সাহায্যে বিষয়বস্তুকে পরাতত্ত্বের স্তরে উন্নীত করে। সার্বজনীন আবেদনের সামগ্রীতে পরিণত করতে সক্ষম হ'য়েছেন। একদিকে সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এবং তাঁর শুভংকর বিধান অন্যদিকে পতিত ও বিকৃত শক্তির প্রতিনিধি শয়তান যে মানুষকে—ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে স্বর্গভ্রষ্ট করে মর্তের ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত করে—এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব নিয়ে মহাকাব্য নিঃসন্দেহে অভিনব সৃষ্টি। দান্তে এবং মিলটন লৌকিক ঘটনা নিয়ে না লিখলেও তাঁদের সৃষ্টি বাস্তবেরও অধিক বাস্তব বলে গৃহীত হয়ে এসেছে এবং এই কারণেই যে যে বিষয়বস্তুকে তাঁরা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন সেই ধর্মদর্শনের আবেদন প্রত্যেক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর কাছে অসামান্য —আবেদন সার্বজনীন।

মানুষের জীবনে পাপবুদ্ধি এবং ধর্মবুদ্ধির দ্বন্দ্ব চলেছে—পাপবুদ্ধির প্রেরণায় মানুষ তার শ্রেয়লাভে বঞ্চিত হয়—দুঃখ দুর্ভোগ ভোগ করে—এই ধারণাটি প্রত্যেক ধর্মদর্শনেই আছে এবং আছে ব'লেই দান্তে বা মিলটনের কাব্য বিশেষ এক ধর্মদর্শনের কাব্য হওয়া সত্ত্বেও, সকল দেশের লোকের মনে সাড়া জাগিয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মহাকাব্য-বাতিক দেখা দিয়েছিল। বীর-রসাত্মক কাব্যকে (heroic) শ্রেষ্ঠ কাব্য ব'লে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হ'য়েছিল। কাউলের (Cowley) 'Davideis' এই বাতিকের একটি সুন্দর নিদর্শন। এই বাতিকেই ড্রাইডেন—বীররসাত্মক নাটক (heroic plays) লিখেছিলেন। এই বাতিককে ব্যঙ্গ করবার উদ্দেশ্যেই পোপ 'Dunciad' (১৭২৮-৪৩) এবং ভলতেয়ার অশ্লীল—'Pucelle' (১৭৫৫) লিখেছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে মহাকাব্য লেখার প্রবৃত্তি একেবারে মরে যায়নি। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতেও 'মহাকাব্য' লেখার ঝোঁক দেখা গিয়েছে। প্রাচীন রীতি হয়তো অনুসৃত হয়নি, কিন্তু মহাকাব্যের যা ধর্ম সেই ধর্মটি এদের মধ্যে পাওয়া যায়। কোন কোন কবি পদ্যবন্ধ ত্যাগ ক'রে, গদ্যবন্ধ অথবা দৃশ্য-রীতি অবলম্বন করেছেন বটে, কিন্তু রচনায় মহাকাব্যোচিত ব্যাপ্তি ও মহত্ত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

এই সব মহাকাব্যের নিদর্শন হিসাবে গ্যেটের ফাউষ্ট (১৭৯০) হারম্যান উণ্ড ডোরোথিয়া, আমেরিকার জোয়েল বার্লো (Joel Barlowe) রচিত

"দি কলম্বিয়াড (১৮০৭), মেলভিল (Melville) রচিত উপন্যাস "মবি ডিক" (১৮৫১) ; ম্যাথু আর্নল্ড রচিত "সোহরাব এ্যাণ্ড রুস্তম্ (১৮৫৩), টলস্টয় রচিত "ওয়ার এ্যাণ্ড পিস" (১৮৬৯), ফার্গুসন রচিত "কোঙ্গল" (Congal) (১৮৭২), উইলিয়ম মরিস-কৃত 'সিগার্ড দি ভোলসুঙ' (Sigurd the Volsung) মি. ডটি-কৃত 'দি ডন ইন্ ব্রিটেন', ল্যাণ্ডর-কৃত "গেরিব" (Gerib), হার্ডি রচিত মহানাটক—"দি ডাইনাষ্টস্", ভিনসেণ্ট বেনেটকৃত 'জন ব্রাউনস্ বডি' (১৯২৮) নাটক প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য গদ্যবদ্ধ বা দৃশ্যরীতিক রচনাকে মহাকাব্য বলা হবে কিনা, গদ্যবদ্ধ রচনা মহাকাব্যের পর্যায়ে পৌছতে পারলেও, দৃশ্যরীতিক রচনা অভিনেয়ত্ব বজায় রেখে মহাকাব্যের বিস্তারধর্মিতা পূর্ণমাত্রায় লাভ করতে পারে কি না—এ সব মহাকাব্যের তত্ত্বগত প্রশ্ন। এখানে ঐ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা না করেও বলা যায়—মহাকাব্য শব্দটিকে 'পদ্যবদ্ধ' বর্ণনাত্মক রচনা অর্থে ব্যবহার করতে বাধ্য হ'লে আমরা গদ্যবদ্ধ মহাকাব্যকে 'মহোপন্যাস' এবং দৃশ্যরীতিক মহাকাব্যকে—'মহানাটক' বলতে পারি। তবে ব্যাপক অর্থে কাব্য, উপন্যাস নাটক সবই 'কাব্য' সুতরাং মহাকাব্য মহোপন্যাস এবং মহানাটক—মহান্ কাব্যেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

(খ) আমেরিকার মহাকাব্য :—

ইউরোপীয় আধুনিক মহাকাব্যের বিবরণ দিতে গিয়ে প্রসঙ্গত আমেরিকার মহাকাব্য রচনার উল্লেখ করেছি। মহাকাব্য পদবাচ্য রচনা আমেরিকায় খুব বেশী হয়নি। জোয়েল বার্লো প্রথম ১৭৮৭ খ্রীঃ 'দি ভিশান অফ কলম্বাস' নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন এবং ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্যকেই 'দি কলাম্বিয়াড্' নামে প্রকাশ করেন। মহাকাব্য হিসাবে 'দি কলাম্বিয়াড' খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। মহাকাব্যের রসতৃষ্ণা মেটাবার মতো সামর্থ্য তার নেই।

আমেরিকার দ্বিতীয় মহাকাব্য—ঔপন্যাসিক মেলভিলের বিখ্যাত উপন্যাস—'মবি ডিক' (১৮৫১)। উপন্যাসখানি যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন কেউই তার মধ্যে মহত্ত্ব খুঁজে পাননি। এখন সকলেই উপন্যাসখানির মহত্ত্ব স্বীকার করেছেন এবং উচ্চাঙ্গের সংকেত দেখতে পেয়েছেন। কাহিনীটি বাইরের দিক থেকে সামান্যই। ক্যাপ্টেন আহাব একটি 'শ্বেত তিমি' দেখার

পরে তিমিটিকে শিকার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—'শ্বেত তিমি'র পেছনে পেছনে ছুটছেন, ঝড় বৃষ্টি বাধা বিপত্তি ক্ষয় ক্ষতি কোন কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, তার উদ্দাম কামনাকে প্রশমিত করতে পারছে না—শ্বেত তিমি তার একমাত্র লক্ষ্য। এই দিক থেকে দেখলে 'মবিডিক' একটি শিকার কাহিনী মাত্র। কিন্তু এই শিকার-কাহিনীকেই মেলভিল গভীর ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করেছেন—ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের এবং অপ্রাপ্যকে পাওয়ার উন্মত্ত কামনার রূপকে পরিণত করেছেন।

(গ) **পারস্যের মহাকাব্য ঃ—**

শাহনামা (১০০০) কবি ফেরদৌসী জামসিদ, রোস্তম এবং আরো অনেক পারসিক বীর এবং রাজগণের কাহিনী এই কাব্যে সংকলিত করেছেন। গ্রন্থখানির নামেই প্রকাশ – গ্রন্থখানি শাহ অর্থাৎ রাজাদের কাহিনী। প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে সাসানিয়ান সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতন পর্যন্ত (২২৪-৬৫২ খ্রীঃ) পারস্যের ইতিহাস কবি ফেরদৌসী বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা এত কবিত্বপূর্ণ যে 'শাহনামা' কালিদাসের রঘুবংশের মতোই মহাকাব্য হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। এই কাব্যে কবি পারস্যের পৌরাণিক রাজাদের রাজত্ব, জামসিদের রাজত্বের স্বর্ণ যুগ, স্বেচ্ছাচারী জাহ্‌হকদের সহস্র বৎসরব্যাপী শাসন, ফেত্বুনের রাজত্বে পারস্যের জাতি হিসাবে পুনরুত্থান, ইরাণের সঙ্গে তুরাণের দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধ, পারস্যবীর রুস্তমের বিস্ময়কর বীরত্ব, আলেকজাণ্ডারের অভিযান, পারস্যের খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন জীবন, সাসানিয়ান সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতন সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এই কাব্যে হোমারের ইলিয়াড অডিসির বা ভার্জিলের এনিডের কার্য-ঐক্য নেই অথবা বিওউলফ বা 'জেরুজালেম লিবারেটা'র মতো ব্যক্তি ঐক্য নেই। পূর্বাপর পর্যায়ক্রমে একাধিক ব্যক্তির একাধিক কাহিনী এতে গ্রথিত বা সঙ্কলিত হয়েছে। এই জাতীয় মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত আমাদের কালিদাসের "রঘুবংশম্"—রঘুবংশের কাহিনী।

(ঘ) **ভারতীয় মহাকাব্য :—**

ভারতীয় মহাকাব্য সমূহকে আমরা কালের ভিত্তিতে দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। এক—প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত এবং প্রাকৃত মহাকাব্য।

দুই—আধুনিক-ভারতীয় ভাষায় লেখা মহাকাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে নিম্নলিখিত মহাকাব্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১। রামায়ণ—বাল্মীকি রচিত	৪। কিরাতার্জ্জুনীয়—ভারবি রচিত
২। মহাভারত—ব্যাস রচিত	৫। নৈষধ চরিত—শ্রীহর্ষ রচিত
৩। রঘুবংশ—কালিদাস রচিত	৬। শিশুপালবধ—মাঘ রচিত

এই মহাকাব্যগুলির মধ্যে প্রথম দু'খানি—খাঁটি মহাকাব্য এবং অন্যগুলি অলংকার শাস্ত্রসম্মত (লিটারারি) মহাকাব্য। পৃথিবীতে খাঁটি 'মহাকাব্য' আছে মোট চারখানি :—দু'খানি গ্রীসের, দু'খানি ভারতের। গ্রীসের দু'খানি হোমারের ইলিয়াড এবং অডিসি, ভারতের দু'খানি—বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত। এই চারখানি মহাকাব্যের তুলনামূলক আলোচনা আজও কেউ করেননি—অবশ্য আমি পরিপাটি আলোচনার কথাই বলছি।

আলোচনা করলে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে হোমারের ইলিয়াড এবং অডিসি, কি বিস্তারে কি গভীরতায় রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে—বিশেষতঃ মহাভারতের চেয়ে অনেক ছোট এবং মহাভারত পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। হোমারের এবং বাল্মীকির মনের সঙ্গে ব্যাসের মনের তুলনা করতে গেলেই দেখা যাবে—হোমারের এবং বাল্মীকির কল্পনারও অনুভবশক্তির প্রখরতা বিস্ময়কর বটে কিন্তু কল্পনায় অনুভবে এবং মননে ব্যাসের মনের যে বিশালতা তা আমাদের মনকে বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়। বাল্মীকির মননশক্তি হোমারের চেয়ে বেশী এ কথা হয়তো ঠিক কিন্তু ব্যাসের মননশক্তির কাছে বাল্মীকির মস্তিষ্ক দাঁড়াতেই পারে না। যে "গীতা"কে ইউরোপীয় মনীষীরা মহাকাব্যের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হননি, সেই গীতা মহাভারতেরই অন্যতম একটি পরিস্থিতির অভিব্যক্তি এবং ব্যাসের মননশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ। খুবই ক্ষোভের বিষয়, আমরা আজও রামায়ণ মহাভারতকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারিনি। হোমারের নাম শুনেই আমাদের শিক্ষিতরা যেমন আবেশ অনুভব করেন, তাঁদের কাছে বাল্মীকি—ব্যাসের নামের তেমন প্রতাপ নেই। আমাদের পাঠ্যতালিকায় এখনও রামায়ণ, মহাভারতের কোন স্থান নেই এবং এখনও আমাদের বুদ্ধি স্বাধীনভাবে ভালমন্দ বিচার করতে চায় না, প্রতীচ্যের সব কিছুকেই নির্বিচারে শ্রেষ্ঠ স্থান ছেড়ে দিয়ে

নিরাপদ থাকতে চায়। যেদিন চিন্তার স্বাধীনতা আসবে সেদিন আমরা হোমারকে অবশ্যই বড় কবি বলব এবং বাল্মীকি ব্যাসকে আরো বড় কবি ব'লে স্বীকার করব।

রামায়ণ ভারতের আদি মহাকাব্য এবং আদি কবি মহামুণি বাল্মীকির সৃষ্টি—ত্রেতাযুগের রামের কাহিনী এবং রামেরই সমসাময়িক বাল্মীকির রচনা। রামের অশ্বমেধযজ্ঞে সীতার দুই পুত্র লব ও কুশ বাল্মীকি-রচিত এই মহাকাব্যখানি গান করেছিলেন—এই লোকপ্রসিদ্ধি সত্য হ'লে রামায়ণের রচনাকালকে আমরা নিশ্চয়ই খ্রীষ্টপূর্বাব্দ কোন দূর অতীতে সন্নিবেশ করতে বাধ্য। কিন্তু পণ্ডিতদের গবেষণায় বর্তমান—রামায়ণের মূল অংশের রচনাকাল—খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দ এবং সম্পূর্ণ রামায়ণ এক কবির রচনা নয়, উত্তরকাণ্ড অন্য কোন কবি পরবর্তীকালে মূল রামায়ণের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। তবে প্রক্ষিপ্ত কাণ্ডটিও বহুকাল পূর্বে মূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং একা বাল্মীকির নামেই চলে আসছে। পণ্ডিতদের গবেষণা নিয়ে পণ্ডিতরা থাকুন। আমরা রামায়ণকে ইলিয়াড-অডিসি থেকে অর্বাচীন মনে করার কোন কারণ দেখি না। কারণ রামায়ণে প্রাচীনযুগের আবহাওয়া যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়।

***রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত ঃ—**

১।	বালকাণ্ড	— ৭৭ সর্গ
২।	অযোধ্যাকাণ্ড	—১১৯ সর্গ
৩।	অরণ্যকাণ্ড	— ৭৫ সর্গ
৪।	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	— ৬৭ সর্গ
৫।	সুন্দরকাণ্ড	— ৬৮ সর্গ
৬।	যুদ্ধকাণ্ড	—১২৮ সর্গ
৭।	উত্তরকাণ্ড	—১১১ সর্গ
	(৭ কাণ্ড)	—(৬৪৫ সর্গ)

দশরথের গৃহে রামের জন্ম থেকে আরম্ভ করে—সরযূ নদীতে রামের প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা এই কাব্যে বাল্মীকি বর্ণনা করেছেন। সমগ্র রামায়ণকাহিনী বিবৃত করার অবকাশ এখানে নেই। প্রয়োজনও নেই

কারণ রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় অনেকেরই আছে। এখানে কাণ্ডগুলির বর্ণনীয় বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি তাতেই রামায়ণের মোটামুটি রূপটি পাওয়া যাবে। *(বিষয় সূচী রাজশেখর বসু-মহাশয়ের বাল্মীকি রামায়ণ থেকে সংগৃহীত)।

(ক) **বালকাণ্ডে বর্ণিত** ঃ—নারদ-বাল্মীকি-সংবাদ (১ম সর্গ)—ক্রৌঞ্চবধ—বাল্মীকির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ (২য় সর্গ)—রামায়ণ রচনা—কুশ ও লবের রামায়ণ গান (৩-৪)—অযোধ্যা—রাজা দশরথ (৫-৭)—দশরথের পুত্রকামনা—ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান (৮-১০)—ঋষ্যশৃঙ্গের অযোধ্যায় আগমন—অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন (১১-১৩)—অশ্বমেধযজ্ঞ- বিষ্ণুর নরজন্ম স্বীকার (১৪-১৭)—রামাদির জন্ম—বিশ্বামিত্রের আগমন (১৮-২১), বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষ্মণের গমন (২২-২৫)—তাড়কাবধ—রামের সিদ্ধাস্ত্র-লাভ—সিদ্ধাশ্রম—মারীচের নিগ্রহ—মিথিলাযাত্রা—গিরিব্রজ—বিশ্বামিত্রের বংশবৃত্তান্ত (৩১-৩৪)—গঙ্গার উপাখ্যান-কার্তিকেয়র জন্ম (৩৫-৩৭)—সগররাজার উপাখ্যান (৩৮-৪১)—ভগীরথের গঙ্গানয়ন (৪২-৪৪)—বিশালা-ক্ষীরোদমন্থন—মারুতগণের উৎপত্তি (৪৫-৪৭)—মিথিলায় প্রবেশ—অহল্যার শাপমোচন (৪৮-৪৯)—বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধের ইতিহাস (৫০-৫৬)—ত্রিশঙ্কুর ইতিহাস (৫৮-৬০)—শুনঃশেপের উপাখ্যান (৬১-৬২)—বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ (৬৩-৬৫)—হরধনু ভঙ্গ (৬৬-৬৭)—রামাদির বিবাহ (৬৮-৭৩)—পরশুরামের তেজোহরণ (৭৪-৭৬) অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন (৭৭) ॥

(খ) **অযোধ্যাকাণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়** ঃ—দশরথের অভিলাষ (১-৩)—রামের অভিষেকের আয়োজন (৪-৬)—মন্থরার মন্ত্রণা (৭-৯)—কৈকেয়ীর নির্বন্ধ (১০-১১)—দশরথের সত্যপাশ (১২-১৪)—রামের পিতৃসত্য গ্রহণ (১৭-১৯)—কৌশল্যার খেদ, লক্ষ্মণের ক্রোধ (২০-২৫)—সীতার সংকল্প (২৬-৩০)—লক্ষ্মণের কর্তব্য নির্ণয়—রামের ধন বিতরণ (৩১-৩২)—বনযাত্রার উপক্রম (৩৩-৩৮)—বনযাত্রা (৩৯-৪১)—দশরথ-কৌশল্যার পুত্রবিরহ (৪২-৪৪) বনবাসের প্রথম রাত্রি (৪৫-৪৮) শৃঙ্গবেরপুর—নিষাদরাজ গুহক (৪৯-৫২)—প্রয়াগ ভরদ্বাজআশ্রম—চিত্রকূট(৫৩-৫৬) সুমন্ত্রের বার্তা (৫৭-৬০)—মুনিকুমার-দের ইতিহাস (৬১-৬৪)—দশরথের মৃত্যু (৬৫-৬৮) ভরতের অযোধ্যায় আগমন (৬৯-৭২)—ভরতের ক্ষোভ (৭১-৭৮)—ভরতের রাজ্য প্রত্যাখ্যান (৭৯-৮২)

গুহ-সকাশে ভরত (৮১-৮৯)—ভরদ্বাজের আতিথ্য (৯০-৯২)—চিত্রকূটে ভরত (৯৩-৯৯) রাম-ভরত-মিলন (১০০-১০৪) রাম-ভরত-জাবালি বশিষ্ঠ সংবাদ (১০৫-১১১)—ভরতের প্রত্যাবর্তন—রামের চিত্রকূট ত্যাগ—অত্রি-অনসূয়া (১১৬-১১৯)॥

(গ) **অরণ্য কাণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়ঃ**—বিরাধ বধ (১-৫), শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ ঋষি (৫-৮), সীতার অহিংসা—ইল্বল বাতাপি কথা (৯-১১), অগস্ত্যের আশ্রম—জটায়ু (১২-১৪), পঞ্চবটী (১৫-১৬), শূর্পণখার প্রেমপরিণাম (১৭-২০), খর-দূষণের সঙ্গে রামের যুদ্ধ (২১-২৬), ত্রিশিরা ও খরের নিধন (২৭-৩০), অকম্পন ও শূর্পণখার বার্তা (৩১-৩৪) রাবণ মারীচ সংবাদ (৩৫-৫১), মায়ামৃগ মারীচ বধ (৪২-৪৪), সীতার মতিভ্রম (৪৫), সীতা হরণ (৪৬-৪৯), জটায়ুর পরাভব (৫০-৫১), রাবণের হস্তে সীতা (৫২-৫৬), সীতান্বেষণ—রামের বিলাপ (৫৭-৬৩), রামের ক্রোধ (৬৪-৬৬), জটায়ুর মৃত্যু (৬৭-৬৮), অয়োমুখী কবন্ধ (৬৯-৭৩), শবরীর ইষ্টলাভ (৭৪-৭৫)।

(ঘ) **কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডঃ**—

পম্পা (১), লক্ষ্মণ হনুমান সংবাদ (২-৪), রাম সুগ্রীবের মৈত্রী (৫-৮), বালী সুগ্রীব বিরোধের ইতিহাস (৯-১১), সপ্তশাল ভেদ (১১-১২), বালী সুগ্রীবের যুদ্ধ (১২-১৬), বালীর ভর্ৎসনা—রামের উত্তর (১৭-১৮), তারার শোক—বালীর মৃত্যু (১৯-২৫), সুগ্রীবের রাজ্যলাভ—প্রস্রবণগিরি (২৬-২৭), বর্ষাঋতু (২৮), শরৎ-ঋতু (২৯-৩০), লক্ষ্মণের সুগ্রীবকে ভর্ৎসনা (৩১-৩৬), সুগ্রীবের সৈন্য সংগ্রহ (৩৭-৩৯), সীতা অন্বেষণের উদ্যোগ (৪০-৪৬), তাপসী স্বয়ম্প্রভা (৪৭-৫৫), সম্পাতি (৫৬-৬০), সাগরলঙ্ঘনের উপক্রম (৬৪-৬৭)।

(ঙ) **সুন্দরকাণ্ডঃ**

হনুমানের সাগরলঙ্ঘন (১), লঙ্কাপুরী (২-৫), রাবণের ভবন (১১), অশোকবন (১২-১৭), সীতা-সকাশে রাবণ (১৮-২২), ত্রিজটার স্বপ্ন (২৩-২৯). সীতা হনুমান-সংবাদ (৩০-৪০), হনুমানের রাক্ষস সংহার (৪১-৪৭), হনুমানের বন্ধন (৪৮), রাবণ সভায় হনুমান (৪৯-৫১), বিভীষণের উপদেশ (৪২), লঙ্কাদাহ (৫৩-৫৫), হনুমানের প্রত্যাবর্তন (৫৬-৫৯), বানরসেনার মধুপান (৬০-৬২), হনুমানের বার্তা (৫৩-৬৮)।

(চ) **যুদ্ধকাণ্ড ঃ**

যুদ্ধযাত্রা (১-৫), রাবণের মন্ত্রণা (৬-১৩), বিভীষণের রামপক্ষে গমন (১৪-১৯), শুকের দৌত্য—সমুদ্রশাসন—সেতুবন্ধন (২০-২১), রাবণের রামসেনা দর্শন (২৩-৩০), রামের মায়ামুণ্ড (৩১-৩২), সরমা (৩৩-৩৪), মাল্যবানের উপদেশ (৩৫-৩৬), সুগ্রীব রাবণের যুদ্ধ (৩৭-৪০), রাম-রাবণ-সেনার যুদ্ধ (৪১-৪২), নাগপাশে রাম-লক্ষ্মণ (৪৫-৫০), ধূম্রাক্ষ-বজ্রদংষ্ট্র-অকম্পন-প্রহস্ত বধ (৫১-৫৮), রাবণের যুদ্ধ (৫৯), কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ (৬০), কুম্ভকর্ণবধ (৬১-৬৭), নরান্তক-দেবান্তক-মহোদর-ত্রিশিরা-মহাপার্শ্ব-বধ (৬৮-৭০), অতিকায়বধ (৭১-৭২), ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ (৭৩), হনুমানের ওষধিআনয়ন (৭৪) কম্পন-প্রজঙ্ঘ-শোণিতাক্ষ-যূপাক্ষ-কুম্ভ-নিকুম্ভ বধ (৭৫-৭৭), মকরাক্ষবধ (৭৮-৭৯), মায়াসীতা (৮০-৮৪), নিকুম্ভিলায় লক্ষ্মণ ও বিভীষণ (৮৫-৮৭), ইন্দ্রজিৎ বধ (৮৮-৯০), রাবণের ক্ষোভ (৯১-৯৩), রাক্ষসীবিলাপ-বিরূপাক্ষ-মহোদর-মহাপার্শ্ব-বধ (৯৪-৯৮), লক্ষ্মণের শক্তিশেল (৯৯-১০১), রাবণ-বধ (১০২-১০৯), রাবণপত্নীদের শোক—রাবণের অন্ত্যেষ্টি (১১০-১১১), বিভীষণের অভিষেক—সীতার ক্ষমা—(১১২-১১৩), রামের সীতা-প্রত্যাখ্যান (১১৪-১১৫), সীতার অগ্নি-পরীক্ষা (১১৬-১১৮), দশরথের আবির্ভাব—ইন্দ্রের বর (১১৯-১২০), রামের প্রত্যাবর্তন (১২১-১২৩), ভরত-হনুমানসংবাদ (১২৪-১২৬), রামের অভিষেক—রামায়ণ মাহাত্ম্য (১২৭-১২৮)।

(ছ) **উত্তরকাণ্ড ঃ**

রাম-সকাশে অগস্ত্যাদি—বৈশ্রবনের কথা (১৩), রাক্ষসগণের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ (৪-৮), রাবণাদির পূর্ববৃত্তান্ত (৯-১৩), রাবণের কুবের জয়—মহাদেবের বর (১৪-১৬), বেদবতী-মরুও-অনরণ্য (১৭-১৯), যম-রাবণের-যুদ্ধ-নিবাতকবচ—বরুণপুরী (২০-২৩), বলি-সূর্যলোক-মান্ধাতা-চন্দ্রলোক-কপিল (প্রক্ষিপ্ত ৫)—শূর্পণখা-ইন্দ্রজিৎ-কুম্ভীনসী (২৪-২৫), রম্ভা-নলকুবর ইন্দ্রের পরাজয়—অহল্যা (২৬-৩০), কার্তবীর্যার্জুন ও রাবণ (৩১-৩৩), বালী ও রাবণ (৩৪), হনুমানের পূর্ববৃত্তান্ত (৩৫-৩৭), বালী-সুগ্রীবের উৎপত্তি—রাবণের মৃত্যুকামনা (প্রক্ষিপ্ত—২ সর্গ), জনক-সুগ্রীব-বিভীষণের প্রস্থান (৩৮-৪০), পুষ্পকরথ—সীতার গর্ভলক্ষণ (৪১-৪২), অযোধ্যার জনরব (৪৩-৪৫), সীতাবিসর্জন (৪৬-৫২), নৃগ-নিমি-উর্বশী-পুরূরবা-বশিষ্ঠ-যযাতি (৫৩-৫৯), কুকুর ও সর্বার্থসিদ্ধি—গৃধ্র ও

উলূক (প্রক্ষিপ্ত ৩), লবণাসুরের উপদ্রব (৬০-৬৪), বাল্মীকি আশ্রমে শত্রুঘ্ন—কুশলবের জন্ম (৬৫-৬৬), লবণ-বধ (৬৭-৬৯), মধুপুরী-শত্রুঘ্নের রামায়ণ শ্রবণ (৭০-৭১), শম্বুকের শিরশ্ছেদ—অগস্ত্য (৭২-৭৬), সুদেবপুত্র শ্বেত, দণ্ডকারণ্যের ইতিহাস (৭৯-৮১), বৃত্রবধের কথা (৮২-৮৬), ইল ও বুধ-পুরূরবার জন্ম রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ (৯১-৯২), কুশ-লবের রামায়ণ গান (৯৩-৯৪), সীতার রসাতলে প্রবেশ (৯৫-৯৭), রামের শোক—কৌশল্যাদির মৃত্যু (৯৮-৯৯), ভরত ও লক্ষ্মণের পুত্রদের রাজ্যলাভ (১০০-১০২), রামসকাশে কাল—লক্ষ্মণবর্জন (১০৩-১০৬), রামের মহাপ্রস্থান (১০৭-১১০), রামায়ণ-মাহাত্ম্য (১১১)।

উল্লিখিত বিষয়সূচী থেকে রামায়ণের বৃত্তটির যে রেখারূপ পাওয়া যায় তা'তেই রামায়ণ-মহাকাব্যের 'বিস্তারটি' স্পষ্টাকারে প্রতিভাত হয়। কিন্তু বিস্তার'ই তো মহাকাব্যের একমাত্র লক্ষণ নয়, যেজীবনকেমহাকাব্যউপস্থাপিত করে তার মহত্ত্বের মাত্রার উপরেই মহাকাব্যের মহত্ত্ব নির্ভর করে। রামের জীবনকে আশ্রয় করে বাল্মীকি মানব-মহিমার যে আলেখ্য নির্মাণ করেছেন—পুরুষার্থ-সাধনার তথা শ্রেয়োনিষ্ঠার যে আদর্শ প্রদর্শন করেছেন তার মধ্যেই রামায়ণের প্রকৃত মহত্ত্ব নিহিত রয়েছে। ইলিয়াড মহাকাব্যের সঙ্গে রামায়ণের মৌলিক পার্থক্য এখানেই—ইলিয়াড যেখানে মানুষের উদ্দাম প্রবৃত্তির কাব্য, রামায়ণ সেখানে প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে নিবৃত্তিকে স্থাপনা করার কাব্য—মানব-মহিমার অবিস্মরণীয় আলেখ্য। মানব-মহিমাবোধের এই উচ্চ মান ইলিয়াড অডিসিতে নেই এবং নেই বলেই, রামায়ণ মহত্ত্বের মূল্যে অনেক বড়।

২। ব্যাসরচিত মহাভারত

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মহাভারত শুধু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেরই বৃহত্তম গ্রন্থ নয়, পৃথিবীর সকল মহাকাব্যের মধ্যে বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠ। 'ব্যাস' নামক একজন ব্যক্তি এই বৃহত্তম গ্রন্থ রচনা করেছেন কিনা অথবা বহুকাল ধরে বহু কবির রচনার দ্বারা সম্বলিত হয়ে মূল কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধ কাহিনী বর্তমান অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতে পরিণত হয়েছে কিনা—এ প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যত বাদবিতণ্ডাই দেখা দিক,এ কথা অস্বীকার করার উপায়নেই যে মহাভারতে আমরা "একটি জাতির সমগ্রতার বিরাট মূর্তি" (রবীন্দ্রনাথ) প্রত্যক্ষ করতেপারি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাক্—"আর্য সমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া

পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাস) এক করিলেন। জনশ্রুতি নহে আর্য সমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চরিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ......ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্ব-রচিত স্বাভাবিক ইতিহাস। "(ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)॥" এ কথা সত্য যে "মহাভারতকথা স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক ব্যাপারের বিচিত্র সংমিশ্রণ"। কিন্তু এ কথাও সত্য—"অতি প্রাচীন ইতিহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপন্ন এই পরিবেশে আমরা যে নরনারীর সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ সুখদুঃখ আমাদেরই সমান। মহাভারতের যা' মুখ্য অংশ, কুরুপাণ্ডবীয় আখ্যান, তার মনোহারিতা অপ্রাকৃত ব্যাপারের চাপে নষ্ট হয়নি। স্বাভাবিক মানব চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত, নাটকীয় ঘটনাসংস্থাপন সরলতা ও চক্রান্ত, করুণা ও নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা ও প্রতিহিংসা, মহত্ত্ব ও নীচতা নিষ্কাম কর্ম ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা সবই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। (মহাভারত—ভূমিকা—রাজশেখর বসু)॥ আর সব কিছুর ভেতর দিয়ে পাওয়া যায় বিশ্বরহস্যের বা পরাতত্ত্বের পটভূমিতে উদ্‌ভাসিত মহাজীবন-তৃষ্ণার ঐকান্তিক রূপ এবং জীবন সত্যের উদ্‌ঘোষণা—

"সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচযা : পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়া ঃ
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥

মহাভারত জীবনের মোহ ও মোহমুক্তির মহাকাব্য—এবং অতুলনীয় মহাকাব্য। অন্যান্য মহাকাব্যকে যদি আমরা 'মহান' বলি, এক মহাভারতকেই বলতে পারি—মহীয়ান।

এই মহাকাব্য ১৮ পর্বে এবং এর প্রত্যেকটি পর্ব বহু অধ্যায়ে বিভক্ত। উপাখ্যান সহিত এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যান ভাগ বর্জন করে ব্যাস চব্বিশ হাজার শ্লোকে এক সংহিতা রচনা করেছিলেন, পণ্ডিতগণের মতে তাই প্রকৃত মহাভারত। তা ছাড়া ব্যাস দেড়শ শ্লোকে সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত অনুক্রমণিকা-অধ্যায়ে দিয়েছেন।...তিনি ষাট লক্ষ শ্লোকে আর একটি মহাভারত সংহিতা রচনা করেছিলেন, তার ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনর লক্ষ পিতৃলোকে, চৌদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মনুষ্যলোকে প্রচলিত আছে। (পর্বসংগ্রহ-পর্বাধ্যায়)॥

* মহাভারতের ১৮ পর্ব এবং—বিষয়সূচী

১। আদিপর্ব ২। সভাপর্ব ৩। বনপর্ব ৪। বিরাটপর্ব ৫। উদযোগপর্ব ৬। ভীষ্মপর্ব ৭। দ্রোণপর্ব ৮। কর্ণপর্ব ৯। শল্যপর্ব ১০। সৌপ্তিকপর্ব ১১। স্ত্রীপর্ব ১২। শান্তিপর্ব ১৩। অনুশাসনপর্ব ১৪। আশ্বমেধিকপর্ব ১৫। আশ্রমবাসিকপর্ব ১৬। মৌষলপর্ব ১৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ব ১৮। স্বর্গারোহণপর্ব।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের—এবং মহাভারত রচনার কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মতে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ বা ১৪৩০ বালগঙ্গাধর তিলক, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে—১৪০০, এফ. ই. পার্জিটার, অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতির মতে খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতাব্দী এবং ইওরোপীয় পণ্ডিতদের অনুমানে—খ্রীঃ পূঃ ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দীতে মহাভারত রচিত। বলা বাহুল্য, খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীতে রচিত হলেও হোমারের ইলিয়াড—অডিসির চেয়েও প্রাচীনতর, আর তা' না হলে অর্বাচীন।

নিম্নলিখিত বিষয় সূচীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয়সমূহের অতিসংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় লাভ করতে পারি :—

বিষয়সূচী

আদিপর্ব

অনুক্রমণিকা ও পর্বসংগ্রহপর্বাধ্যায়

১। শৌনিকের আশ্রমে সৌতি

পৌষ্যপর্বাধ্যায়

২। জনমেজয়ের শাপ—আরুণি, উপমন্যু ও বেদ

৩। উতঙ্ক, পৌষ্য ও তক্ষক

* **বিষয়সূচী** :—*(রাজশেখর বসু মহাশয়ের মহাভারত থেকে সংগৃহীত)

পৌর্লোমপর্বাধ্যায়

৪। ভৃগু—পুলোমা—চ্যবন—অগ্নির শাপমোচন

৫। রুরু-প্রমদ্বরা-ডুণ্ডুভ ;

আস্তীকপর্বাধ্যায়

৬। জরৎকারু মুনি, কদ্রু ও বিনতা—সমুদ্রমন্থন

৭। কদ্রু-বিনতার পণ—গরুড়—গজকচ্ছপ—অমৃতহরণ

৮। আস্তীকের জন্ম, পরীক্ষিতের মৃত্যুবিবরণ

৯। জনমেজয়ের সর্পসত্র

আদিবংশাবতরণ পর্বাধ্যায়

১০। উপরিচর বসু—পরাশর—সত্যবতী—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

সম্ভবপর্বাধ্যায়

১১। কচ ও দেবযানী

১২। দেবযানী, শর্মিষ্ঠা ও যযাতি

১৩। যযাতির জরা

১৪। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা

১৫। মহাভিষ—অষ্টবসু—প্রতীপ—শান্তনু—গঙ্গা

১৬। দেবব্রত—ভীষ্ম—সত্যবতী

১৭। চিত্রাঙ্গদা ও বিচিত্রবীর্য—কাশীরাজের তিন কন্যা

১৮। দীর্ঘতমা—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম, অণীমাণ্ডব্য

১৯। গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী—কর্ণ দুর্যোধনাদির জন্ম

২০। যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম—পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যু

২১। হস্তিনাপুরে পঞ্চপাণ্ডব—ভীমের নাগলোকদর্শন

২২। কৃপ-দ্রোণ—অশ্বত্থামা—একলব্য—অর্জুনের পটুতা

২৩। অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন

২৪। দ্রুপদের পরাজয়—দ্রোণের প্রতিশোধ

২৫। ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষা

জতুগৃহপর্বাধ্যায়

২৬। বারাণাবত—জতুগৃহদাহ

সভাপর্ব

বনপর্ব

কির্মীরবধপর্বাধ্যায়

৪। কির্মীরবধের বৃত্তান্ত

অর্জুনাভিগমনপর্বাধ্যায়

৫। কৃষ্ণের আগমন ; দ্রৌপদীর ক্ষোভ

৬। শাল্ববধের বৃত্তান্ত—দ্বৈতবন

৭। দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ

৮। ভীম-যুধিষ্ঠিরের বাদানুবাদ—ব্যাসের উপদেশ

৯। অর্জুনের দিব্যাস্ত্রসংগ্রহে গমন

কৈরাতপর্বাধ্যায়

১০। কিরাতবেশী-মহাদেব—অর্জুনের দিব্যাস্ত্রলাভ

ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বাধ্যায়

১১। ইন্দ্রলোকে অর্জুন—উর্বশীর অভিসার

নলোপাখ্যানপর্বাধ্যায়

১২। ভীমের অধৈর্য—মহর্ষি বৃহদশ্ব

১৩। নিষদরাজ নল—দয়মন্তীর স্বয়ংবর

১৪। কলির আক্রমণ—নল-পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া

১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ ; দয়মন্তীর পর্যটন

১৬। কর্কোটকনাগ—নলের রূপান্তর

১৭। পিত্রালয়ে দয়মন্তী—নল-ঋতুপর্ণের বিদর্ভযাত্রা

১৮। নল-দয়মন্তীর পুনর্মিলন।

১৯। নলের রাজ্যোদ্ধার

তীর্থযাত্রাপর্বাধ্যায়

২০। যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা

২১। ইল্বল-বাতাপি—অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা—ভৃগুতীর্থ

২২। দধীচ—বৃত্রবধ—সমুদ্রশোষণ

২৩। সগর রাজা—ভগীরথের গঙ্গানয়ন

২৪। ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান

২৫। পরশুরামের ইতিহাস—কার্তবীর্যার্জুন

২৬। প্রভাস-চ্যবন ও সুকন্যা—অশ্বিনীকুমারদ্বয়

৪৯। দুর্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞ

মৃগস্বপ্নোদ্‌ভব ও ব্রীহিদ্রৌণিক-পর্বাধ্যায়

৫০। যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন—মুদ্‌গলের সিদ্ধিলাভ

দ্রৌপদীহরণ ও জয়দ্রথবিমোক্ষণ-পর্বাধ্যায়

৫১। দুর্বাসার পারণ

৫২। দ্রৌপদীহরণ

৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মুক্তি

রামোপাখ্যানপর্বাধ্যায়

৫৪। রামের-উপাখ্যান

পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বাধ্যায়

৫৫। সাবিত্রী-সত্যবান

কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায়

৫৬। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান

আরণেয়পর্বাধ্যায়

৫৭। যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর

৫৮। ত্রয়োদশবৎসরের আরম্ভ

বিরাটপর্ব

পাণ্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায়

১। অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা

২। ধৌম্যের উপদেশ—অজ্ঞাতবাসের উপক্রম
বিরাটভবনে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন

সময়পালনপর্বাধ্যায়

৪। মল্লগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ

কীচকবধপর্বাধ্যায়

৫। কীচক, সুদেষ্ণা ও দ্রৌপদী

৬। কীচকের পদাঘাত

৭। ভীমের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ

৮। কীচকবধ

৯। উপকীচকবধ—দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা

গোহরণপর্বাধ্যায়

১০। দুর্যোধনাদির মন্ত্রণা
১১। দক্ষিণগোগ্রহ—সুশর্মার-পরাজয়
১২। উত্তরগোগ্রহ—উত্তর ও বৃহন্নলা
১৩। দ্রোণ-দুর্যোধনাদির বিতর্ক—ভীষ্মের উপদেশ
১৪। কৌরবগণের পরাজয়
১৫। অর্জুন ও উত্তরের প্রত্যাবর্তন—বিরাটের পুত্রগর্ব

বৈবাহিক-পর্বাধ্যায়

১৬। পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ—উত্তরা অভিমন্যুর বিবাহ।

উদ্‌যোগপর্ব

সেনোদ্‌যোগপর্বাধ্যায়

১। রাজ্যোদ্ধারের মন্ত্রণা
২। কৃষ্ণ-সকাশে দুর্যোধন ও অর্জুন—বলরাম ও দুর্যোধন
৩। শল্য, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির
৪। ত্রিশিরা, বৃত্র, ইন্দ্র, নহুষ ও অগস্ত্য
৫। সেনাসংগ্রহ

সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায়

৬। দ্রুপদ-পুরোহিতের দৌত্য
৭। সঞ্জয়ের দৌত্য, প্রজাগর ও সনৎসুজাতপর্বাধ্যায়।
৮। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে বিদুর—বিরোচন ও সুধন্বা।

যানসন্ধিপর্বাধ্যায়

৯। কৌরবসভায় বাদানুবাদ।

ভগবদ্‌যানপর্বাধ্যায়

১০। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি ও দ্রৌপদীর অভিমত
১১। কৃষ্ণের হস্তিনাপুর গমন
১২। কুন্তী, দুর্যোধন ও বিদুরের গৃহে কৃষ্ণ।
১১। কৌরবসভায় কৃষ্ণের অভিভাষণ
১৪। রাজা দম্ভোদ্ভব—সুমুখ ও গরুড়

১৫। বিশ্বামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবী

১৬। দুর্যোধনের দুরাগ্রহ

১৭। গান্ধারীর উপদেশ—কৃষ্ণের সভাত্যাগ

১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী—বিদুলার উপাখ্যান

১৯। কৃষ্ণ-কর্ণসংবাদ

২০। কর্ণ-কুন্তী সংবাদ

২১। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন

সৈন্যনির্যানপর্বাধ্যায়

২২। পাণ্ডবযুদ্ধসজ্জা

২৩। বলরাম ও রুক্মী

২৪। কৌরবযুদ্ধসজ্জা

উলূকদূতাগমনপর্বাধ্যায়

২৫। উলূকের দৌত্য

রথ্যতিরথসংখ্যানপর্বাধ্যায়

২৬। রথী-মহারথ-অতিরথ-গণনা—ভীষ্ম-কর্ণের বিবাদ

অম্বোপাখ্যানপর্বাধ্যায়

২৭। অম্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস

২৮। যুদ্ধযাত্রা

ভীষ্মপর্ব

জম্বুখণ্ডবিনির্মাণ ও ভূমি-পর্বাধ্যায়

১। যুদ্ধের নিয়মবন্ধন

২। ব্যাস ও ধৃতরাষ্ট্র

৩। সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও ভূবৃত্তান্ত কথন

ভগবদ্গীতাপর্বাধ্যায়

৪। কুরুপাণ্ডবের ব্যূহরচনা

৫। ভগবদ্গীতা

ভীষ্মবধপর্বাধ্যায়

৬। যুধিষ্ঠিরের শিষ্টাচার—কর্ণ—যুযুৎসু

৭। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধারম্ভ—বিরাটপুত্র, উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু

দ্রোণপর্ব

কর্ণপর্ব

১৪। অশ্বত্থামা ও কর্ণের সহিত যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের যুদ্ধ
১৫। যুধিষ্ঠিরের কটুবাক্য
১৬। অর্জুনের ক্রোধ—কৃষ্ণের উপদেশ
১৭। অর্জুনের সত্যরক্ষা—যুধিষ্ঠিরের অনুতাপ
১৮। অর্জুন-কর্ণের অভিযান
১৯। দুঃশাসনবধ—ভীমের প্রতিজ্ঞাপালন
২০। কর্ণবধ
২১। দুর্যোধনের বিষাদ—যুধিষ্ঠিরের হর্ষ

শল্যপর্ব

শল্যবধপর্বাধ্যায়

১। কৃপ-দুর্যোধনসংবাদ
২। শল্যের সেনাপতিত্বে অভিষেক
৩। শল্যবধ
৪। শাল্ববধ
৫। উলূক-শকুনি বধ

হ্রদপ্রবেশপর্বাধ্যায়

৬। দুর্যোধনের হ্রদপ্রবেশ
৭। যুধিষ্ঠিরের তর্জন

গদাযুদ্ধপর্বাধ্যায়

৮। গদাযুদ্ধের উপক্রম
৯। বলরামের তীর্থভ্রমণ ; চন্দ্রের যক্ষা ; একত দ্বিত ত্রিত
১০। অসিতদেবল ও জৈগীষব্য—সারস্বত
১১। বৃদ্ধকন্যা সুভ্রূ—কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক
১২। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ
১৩। বলরামের ক্রোধ—যুধিষ্ঠিরাদির ক্ষোভ
১৪। দুর্যোধনের ভর্ৎসনা
১৫। ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-সকাশে কৃষ্ণ
১৬। অশ্বত্থামার অভিষেক

সৌপ্তিকপর্ব

সৌপ্তিকপর্বাধ্যায়

১। অশ্বত্থামার সংকল্প

২। মহাদেবের আবির্ভাব

৩। ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রৌপদীপুত্র প্রভৃতির হত্যা

৪। দুর্যোধনের মৃত্যু

ঐষীকপর্বাধ্যায়

৫। দ্রৌপদীর প্রায়োপবেশন

৬। ব্রহ্মশির অস্ত্র

৭। মহাদেবের মাহাত্ম্য

স্ত্রীপর্ব

জলপ্রাদানিকপর্বাধ্যায়

১। বিদুরের-সান্ত্বনাদান

২। ভীমের লৌহমূর্তি

৩। গান্ধারীর ক্রোধ

স্ত্রীবিলাপপর্বাধ্যায়

৪। গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন, কৃষ্ণকে অভিশাপ

শ্রাদ্ধপর্বাধ্যায়

৫। মৃতসৎকার—কর্ণের জন্মরহস্যপ্রকাশ

শান্তিপর্ব

রাজধর্মানুশাসনপর্বাধ্যায়

১। যুধিষ্ঠির সকাশে নারদাদি

২। যুধিষ্ঠিরের মনস্তাপ

৩। চার্বাকবধ—যুধিষ্ঠিরের অভিষেক

৪। ভীষ্ম-সকাশে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি

৫। রাজধর্ম

৬। বেণ ও পৃথু রাজার কথা

৭। বর্ণাশ্রম ধর্ম—চরনিয়োগ—শুল্ক

আপদ্ ধর্মপর্বাধ্যায়

মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়

অনুশাসনপর্ব

আশ্বমেধিকপর্ব

অনুগীতাপর্বাধ্যায়

আশ্রমবাসিকপর্ব

২। ভীমের আক্রোশ—ধৃতরাষ্ট্রের সংকল্প

৩। ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাসম্ভাষণ

৪। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনযাত্রা

৫। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে নারদাদি

৬। ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে যুধিষ্ঠিরাদি

৭। বিদুরের তিরোধান

পুত্রদর্শনপর্বাধ্যায়

৮। মৃতযোদ্ধগণের সমাগম

৯। জনমেজয়ের যজ্ঞে পরীক্ষিৎ—পাণ্ডবগণের প্রস্থান

নারদাগমনপর্বাধ্যায়

১০। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর মৃত্যু

মৌষলপর্ব

১। শাম্বের মুসল প্রসব—দ্বারকায় দুর্লক্ষণ

২। যাদবগণের বিনাশ

৩। বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ

৪। অর্জুনের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন

মহাপ্রস্থানিকপর্ব

১। মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরাদি

২। দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জ্জন ও ভীমের মৃত্যু

৩। যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গযাত্রা

স্বর্গারোহণপর্ব

১। যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন

২। কুরুপাণ্ডবাদির স্বর্গলাভ

৩। মহাভারত মাহাত্ম্য

উল্লিখিত বিষয়সূচী থেকে মহাকাব্যের বিরাটত্ব অনুমান করা, খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে বলে মনে করিনে। কিন্তু প্রকৃত বিরাটত্ব এবং মহীয়ানত্ব উপলব্ধি করবার একমাত্র উপায় যে ব্যাসরচিত মহাকাব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়—সে কথা বলাই বাহুল্য। এ কথা আগেও বলেছি এবং এখন বলছি—

মহাভারতের সমকক্ষ কোন মহাকাব্যে কোন দেশেই এবং কোন যুগেই লেখা হয়নি। হোমারের বর্ণনাশক্তি ভার্জিলের আদর্শপ্রীতি, দান্তের ও মিলটনের ভাবনা শক্তি—সকলের সবকিছু, ব্যাসের মনস্বিতার মধ্যে এসে, পরাকাষ্ঠা বিকাশ লাভ করেছে। মানবচরিত্রের এবং মানব মহিমার এতবড় কাব্য পৃথিবীতে আর একখানিও নেই। হোমার প্রভৃতি মহান, ব্যাস মহীয়ান। হোমার জীবাত্মার কবি ব্যাস মানবাত্মার কবি—মহামানবের কবি। হোমার ভার্জিল-দান্তে-মিলটন প্রভৃতি ধর্মনৈতিক স্তরের অধিবাসী, ব্যাস পরাদার্শনিক স্তরের অধিবাসী। তিনি পরাদর্শের পটভূমিকায় জীবাত্মা-মানবাত্মার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির, মানবজীবনের গতির ও পরিণতির, এক কথায় সনাতন সত্যের মহান আলেখ্য অংকন করেছেন—বিশ্বরূপের লীলার পটভূমিতে অহংকারের রাগ-বিরাগের লীলা, চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশের ছবি দেখিয়েছেন। ব্যাসের শ্রীকৃষ্ণই শুধু বিশ্বরূপ দেখাননি, ব্যাস নিজেও কবিত্বের বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন এবং সেই বিশ্বরূপের মতো মহীয়ান সৃষ্টি আর একটিও নেই।

৩। অশ্বঘোষ রচিত 'সৌন্দরানন্দ' (১৮ সর্গ), 'বুদ্ধচরিত' (১৭ সর্গ)

অশ্বঘোষ একাধারে কবি ও দার্শনিক। তাঁর নিবাস সাকেত এবং মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী। প্রথম ব্রাহ্মণ ছিলেন পরে বৌদ্ধধর্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বুদ্ধের মহাভক্ত হয়েছিলেন।

অশ্বঘোষের কাল সম্বন্ধে আমরা প্রায় অন্ধকারেই আছি। পণ্ডিতরা অনুমান করেন তিনি কনিষ্কের সমসাময়িক। বুদ্ধের জীবন অবলম্বনে তিনি দুখানি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন,—প্রথম মহাকাব্য **সৌন্দরানন্দে** কবি বুদ্ধকর্তৃক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বুদ্ধধর্মে দীক্ষার কাহিনী ১৮টি সর্গে বর্ণনা করেছেন। প্রথম সর্গে—কপিলাবস্তু নগরীর প্রতিষ্ঠার কাহিনী, দ্বিতীয় সর্গে—রাজা শুদ্ধোদনের বর্ণনা—এবং বুদ্ধের জন্ম বর্ণনা, তৃতীয় সর্গে—বুদ্ধের বর্ণনা, চতুর্থ সর্গে সুন্দরীর রূপ—নন্দের সঙ্গে সুন্দরীর নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক—অনিচ্ছায় নন্দের গৃহত্যাগ। ৫ম সর্গে—অনিচ্ছুক নন্দকে বুদ্ধ দীক্ষিত করেছেন, ৬ষ্ঠ সর্গে—সুন্দরীর শোক—৭ম সর্গে নন্দের সংসার-সম্ভোগের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন, ৮ম সর্গে—নারীর রূপ-যৌবনের ছলা-কলার নিন্দা, ৯ম সর্গে—ঐশ্বর্য মদগর্বের

পরিণাম প্রদর্শন। ১০ম সর্গে—নন্দের রূপমোহ দূর করার জন্য বুদ্ধের পরিকল্পনা—বুদ্ধ নন্দকে স্বর্গে নিয়ে যেয়ে অপ্সরাদের রূপ দেখান।—নন্দের অপ্সরা মোহ। নন্দ মর্ত্যে ফিরে আসেন—আনন্দ তাকে স্বর্গসুখ ও রূপের ক্ষণস্থায়িত্ব বিষয়ে উপদেশ দেন। (১২শ-১৮শ) নন্দের মোহ নাশ—বুদ্ধের নিকট উপদেশ গ্রহণ এবং বৌদ্ধধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ।

বুদ্ধচরিত দ্বিতীয় মহাকাব্য। বুদ্ধজীবনের বর্ণনা। কাব্যের মাত্র ১৭টি সর্গ পাওয়া গেছে। এবং তারও ১৩টি খাঁটি, ৪টি জনৈক অমৃতানন্দ কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত।

বর্তমান কাব্যখানি শেষ হয়েছে—বারানসীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে এবং দীক্ষাদানে। কিন্তু এই কাব্যের যে চৈনিক সংস্করণ আছে তাতে আছে ২৮ সর্গ। এই মহাকাব্যে অশ্বঘোষের কবিত্বশক্তির উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য দূর করবার জন্য পিতা শুদ্ধোদনের ঐকান্তিক চেষ্টা—মোহ জন্মানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ করে প্রবল বৈরাগ্যোদয়—প্রভৃতি ঘটনা কবি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪। কালিদাস-কৃত 'রঘুবংশম্'

বাল্মীকি-ব্যাসের পরেরই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যার কবিকীর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত, বাল্মীকি-ব্যাসের মতোই যিনি বিশ্ববন্দিত, তিনি আমাদের অতিপ্রিয়নাম কালিদাস। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের নাট্যকাররূপেই কালিদাস দেশ-বিদেশে সুখ্যাত ও সুপরিচিত হ'লেও, শুধু নাট্য রচনার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, ঋতুসংহার, মেঘদূতম্ প্রভৃতি নাটক ও খণ্ড কাব্য লিখেছিলেন তেমনি "রঘুবংশম্" নামক একখানি মহাকাব্যও (১৯ সর্গ) রচনা করেছিলেন। রঘুবংশেরই কোন বংশধরের তিনি সভাকবি ছিলেন কিনা তা আমরা জানিনে; কার এবং কিসের প্রেরণায় তিনি "রঘুনামন্বয়ং" লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাও আমরা জানিনে, এমন কি তাঁর জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা এবং আবির্ভাবকাল সম্বন্ধেও আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারিনে। "হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ—ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ।" অনুমানের হেঁচকা টানে কখনও তিনি খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যেয়ে পড়ছেন, আবার কখনও তিনি চতুর্থ পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে এসে ছিটকে পড়ছেন।

কিন্তু ভরসার কথা, তার কবিগৌরব তাতে একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি; কালিদাস আজ বিশ্ববন্দিত।

রঘুবংশম্ যদিও 'রঘুনামন্বয়ম্' অর্থাৎ রঘুকুলের ইতিবৃত্ত, তবু তা মহাকাব্যের পদবীতেই আরোহণ করেছে এবং করেছে সেই গুণেই যেগুণে নীরস তথ্য রসময় হয়ে উঠে—'ভাবের কথা'য় পরিণত হয়। কালিদাস রঘুবংশের কাহিনীতে রসের প্রাণসঞ্চার ক'রে তাকে একাধারে ইতিবৃত্ত এবং মহাকাব্যে পরিণত করেছেন। একদিকে রাজা দিলীপ থেকে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত রঘুবংশের পরিচয় দিয়েছেন অন্যদিকে রঘুকুলের রাজাদের জীবন কথার ভিতর দিয়ে চতুর্বর্গের মহা ফল ফলিয়েছেন।

৫। ভারবি-কৃত 'কিরাতার্জুনীয়ম'

কালিদাসই যে শুধু 'ফলেন পরিচীয়তে' তাই নয়, ভারবির সম্বন্ধেও আমরা নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। 'অবন্তীসুন্দরী কথা'য় ভারবি সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় কাঞ্চী-জনপদের পশ্চিমোত্তর দিকে আনন্দপুর নামক পত্তনে বহু কৌশিকগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁদের কেউ কেউ নাসিক্য প্রদেশীয় অচলপুর এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদেরই একজনের নাম ছিল নারায়ণস্বামী। তাঁর দুই পুত্র—প্রথম দামোদর, দ্বিতীয় ভারবি। এঁরা বিষ্ণুবর্ধনের সমসাময়িক। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর শেষার্ধের, বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক।

যে শতাব্দীরই লোক হো'ন ভারবি যে খুব সুপণ্ডিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারবির কাব্য যে 'অর্থগৌরবে'র জন্য প্রসিদ্ধ, তার জন্য মনস্বিতা অত্যাবশ্যক—এ কথা বলাই বাহুল্য। যদিও মল্লিনাথের মতে "নারিকেলফল সম্মিতংবচঃ ভারবেঃ"...তবু সেই বচনের সার অতি সুখসেব্য।

ভারবি মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত কিরাতপর্বাধ্যায়ের শিবার্জুনযুদ্ধ কাহিনী অবলম্বনে অথবা শিবপুরাণীয় জ্ঞানসংহিতার (৬৩-৬৭) অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে 'কিরাতার্জুনীয়ম' মহাকাব্য রচনা করেছেন। এই কাহিনীকে কবি ১৮ সর্গে পরিকল্পিত করেছেন।

১ম সর্গে—দ্বৈতবন নিবাসী যুধিষ্ঠিরের সমীপে দূত বনেচরের সমাগম

—বনেচরকর্তৃক দুর্যোধনের রাজনীতিনৈপুণ্য কীর্তন,—দূতের প্রস্থানের পর পাঞ্চালীর ওজস্বিনী যুদ্ধোদ্দীপিনী বক্তৃতা।

২য় সর্গে বর্ণিত—যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের উর্জস্বী যুদ্ধপক্ষপাতী বচন—যুধিষ্ঠিরের শান্তিবচন—পাণ্ডব সমীপে ব্যাসের আগমন।

৩য় সর্গে—ব্যাসদেবরূপ বর্ণনা—ব্যাসের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভক্তিপূর্ণ উক্তি—ব্যাসের নীতিপূর্ণ আশ্বাসবাক্য—তপস্যা ক'রে অস্ত্রবিদ্যালাভের জন্য অর্জুনের প্রতি ব্যাসের উপদেশ—অর্জুনের যাত্রার উদ্যোগ—অর্জুনের সমীপে যক্ষসমাগম—পাণ্ডবদের বৈমনস্য—অর্জুন-দ্রৌপদী সাক্ষাৎকার—দ্রৌপদীর উদ্দীপনাময়ী উক্তি। হিমালয়ের ইন্দ্রকীলশৈলে অর্জুনের গমন।

৪র্থ সর্গে—শরৎসুষমা বর্ণন—অর্জুনের হিমালয়দর্শন।

৫ম সর্গে—হিমাদ্রিবর্ণনা—অর্জুনের হিমালয়ে উপস্থিতি—যক্ষের প্রস্থান।

৬ষ্ঠ সর্গে—ইন্দ্রকীল পর্বতে অর্জুনের আরোহণ—অর্জুনের তপশ্চরণ, বনরক্ষকের মুখে ইন্দ্রের অর্জুনকৃত তপস্যার বিবরণ শ্রবণ। অর্জুনের তপস্যা ভঙ্গের জন্য অপ্সরাদের প্রতি ইন্দ্রের নির্দেশ।

৭ম সর্গে—গন্ধর্বসহ অপ্সরাগণের ইন্দ্রকীলপর্বতে আমগন—শিবির সন্নিবেশ।

৮ম সর্গে—গন্ধর্ব-অপ্সরাগণের কুসুমচয়নক্রীড়া।

৯ম সর্গে—সন্ধ্যাবর্ণনা, চন্দ্রোদয়বর্ণনা, সুরতক্রীড়াবর্ণনা, পানগোষ্ঠীবর্ণনা ···প্রভাতবর্ণনা।

১০ম সর্গে—পার্থকে প্রলোভিত করতে অপ্সরাগণের বিলাস, পার্থের অবস্থা—বর্ষাঋতু বর্ণনা—তপস্যাভঙ্গের চেষ্টা—চেষ্টার নিষ্ফলতা।

১১শ সর্গে—অর্জুনাশ্রমে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের আগমন। ইন্দ্র-অর্জুন কথোপকথন—ইন্দ্রকর্তৃক অর্জুনের প্রতি শিবারাধনার নির্দেশ।

১২শ সর্গে—অর্জুনের শিবারাধনা। শিবের কাছে সিদ্ধতাপসদের আরাধনার সংবাদ নিবেদন—শিবের অর্জুনের স্বরূপবর্ণনা—বরাহমূর্তিতে মূক-দানবের ধনঞ্জয়কে বধ করার চেষ্টা—কিরাতবেশে শিবের অর্জুনাশ্রমে আগমন।

১৩শ সর্গে—মূকদানবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ—মূকদানববধ—পার্থসমীপে শিবদূতাগম—দূতকর্তৃক পার্থাধিক্ষেপ।

১৪শ সর্গে—শিবদূতের প্রতি অর্জুনের জিগীষাবচন—দূতের মুখে তা শুনে শিবের কিরাতবেশ ধারণ করে সসৈন্যে আগমন এবং শিবার্জুনের সংগ্রাম।

১৫শ সর্গে—চিত্রযুদ্ধবর্ণনা।

১৬শ সর্গে—কিরাতবেশী শিবের অনন্যসাধারণ সমরকৌশল দেখে অর্জুনের মনে বিতর্ক—শিবের সঙ্গে অর্জুনের অস্ত্রযুদ্ধ।

১৭শ সর্গে—প্রথমতঃ শিবসেনার সঙ্গে তারপর স্বয়ং শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ।

১৮শ সর্গে—অর্জুনের বীরত্বে শিবের তুষ্টি—ইন্দ্রাদি দেবগণের সমাগম—অর্জুনের স্তবস্তুতি—বরযাচনা, পাশুপত-অস্ত্রপ্রাপ্তি—দেবগণের স্ব স্ব অস্ত্র-প্রদান। কৃতকার্য অর্জুনের প্রত্যাবর্তন।

বলা-বাহুল্য—অতি সামান্য একটি কাহিনীকে ভারবি সম্প্রসারিত করে মহাকাব্যের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছেন এবং তা' করতে পেরেছেন তার অর্থভাবনা, উদ্ভাবনা এবং বর্ণনা শক্তিবলেই। এ কথাও বলা বাহুল্য—'কিরাতার্জুনীয়ম' মহাকাব্য বটে কিন্তু অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য—রামায়ণ মহাভারতের মতো জাত্ মহাকাব্য নয়।

৬। ভট্টি—রাবণবধ (ভট্টি কাব্য)

মহাকবি ভট্টি (সংস্কৃত ভতৃ শব্দের প্রাকৃত রূপ) একাধারে বৈয়াকরণ এবং কবি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা খুব কম কথাই জানি। যেটুকু নিশ্চিত জানা গেছে তা এই যে তিনি বলভীতে রাজা শ্রীধরসেনের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করিয়েছিলেন। কিন্তু এতেও নিশ্চিত হওয়া যায়নি ; কারণ শ্রীধরসেন নামে চার রাজার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এবং জানা গেছে যে যিনি শেষ শ্রীধরসেন তিনি ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছিলেন। এই তথ্যের উপরে দাঁড়িয়ে আমরা জোর করে এইটুকু বলতে পারি যে ভট্টি ঐ সময়ের পরবর্তী নন।

বলা বাহুল্য ভট্টি রামায়ণ কাহিনী থেকে তার কাব্যের কথাবস্তু সংগ্রহ করেছেন এবং একাধারে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। একদিকে তিনি ব্যাকরণ, ছন্দ, অলংকারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, অন্যদিকে রাবণবধ কাহিনী শুনিয়েছেন। ১২২ সর্গে ভট্টি নিজের বৈয়াকরণিক, ছান্দসিক এবং আলংকারিক প্রতিভার বা শক্তির খেলা দেখিয়েছেন। এই খেলায় আর যাই প্রকাশিত

হোক জীবনের তপ্ত রস পাওয়া যায় না। ভট্টিকে বিদগ্ধরা ভালবাসতে পারেন, কিন্তু রসিকের কাছে ভট্টি দুরাস্বাদ্য। এই মহাকাব্যের কবির কাছে—কাব্য মুখ্যতঃ শব্দার্থের কসরৎ দেখানো, গৌণতঃ বিষয়ের উপস্থাপনা।

৭। কুমারদাস—জানকীহরণ

কাব্যখানি সিংহলীয় অনুবাদ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এবং দক্ষিণ ভারতে প্রকাশিত হয়েছে। কুমারদাস বামনের পূর্ববর্তী—অর্থাৎ ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগের লোক। জানকীহরণ মহাকাব্যখানি ২০ সর্গে বিভক্ত। দশরথ, দশরথ-পত্নী ও অযোধ্যার বর্ণনা থেকে আরম্ভ করে—রামের জয়লাভ পর্যন্ত ঘটনা এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যখানিতে কালিদাসের প্রভাব অতিসংলক্ষ্য। রচনারীতি এবং বিষয়বস্তু—এই দুই বিষয়ে কুমারদাস কালিদাসকে অনুসরণ করেছেন।

৮। মাঘরচিত—শিশুপালবধ

মহাভারত উপাখ্যানের আকর। ভারবির মতো মহাকবি মাঘও মহাভারতের আকর থেকে বিষয়বস্তুমণি সংগ্রহ করেছেন এবং মণিকে মহামণিতে পরিণত করেছেন। সভাপর্বের অর্ঘ্যাভিহরণপর্বাধ্যায়ে যে শিশুপালবধ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেই কাহিনীকেই কবি তার কবি-প্রতিভার স্পর্শে শিশুপালবধ মহাকাব্যে পরিণত করেছেন। 'উপমা কালিদাসস্য ভারবের্থগৌরবম। নৈষধে পদলালিত্যং'—এই সমস্ত গুণ মাঘে একত্র হয়ে—শিশুপালবধকে মহিমান্বিত করেছে। মহাভারতের যে কাহিনী অবলম্বনে মাঘ কাব্য রচনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করবেন। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। বিভিন্ন দেশের রাজা সমুপস্থিত। রাজগণকে অর্ঘ্য দেওয়ার প্রশ্ন উঠতে ভীষ্ম কৃষ্ণের নাম প্রস্তাব করলেন। শিশুপাল কৃষ্ণদ্বেষী তিনি কৃষ্ণ নিন্দা করতে লাগলেন। রাজসভা বাগযুদ্ধের কুরুক্ষেত্রে পরিণত হল। কিন্তু শিশুপাল দমলেন না। তিনি কৃষ্ণকে সম্মুখসমরে আহ্বান জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। এইটুকু ঘটনাকে কবি মহাকাব্যের আয়তনে বিস্তারিত করেছেন এবং ঘটনাকে আশ্রয় করে কল্পনাশক্তির ও মননশক্তির বিস্ময়কর পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবিকই যা বলা হয়েছে—মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ। কালিদাসের

উপমা, ভারবির অর্থগৌরব, শ্রীহর্ষের পদলালিত্য—তিনগুণই মাঘের মধ্যে রয়েছে।

এই সকল মহাকবি ছাড়াও, কম শক্তিসম্পন্ন—একাধিক মহাকাব্য রচয়িতার সাক্ষাৎকার লাভ করে থাকি। তাঁদের মধ্যে হয়গ্রীববধ রচয়িতা মেন্থ (৬ষ্ঠ শতাব্দী), রাবণার্জুনীয় বা অর্জুনরাবনীয় রচয়িতা ভৌমক, বৌদ্ধ মহাকাব্য "কপ্‌ণাভ্যুদয়"—রচয়িতা শিবস্বামিন, হরবিজয়-রচয়িতা রত্নাকর, কাদম্বরীকথাসার রচয়িতা অভিনন্দ, ভারতমঞ্জরী এবং দশাবতার চরিত রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র, শ্রীকণ্ঠচরিত-রচয়িতা মংখ (১২শ,) বালভারত রচয়িতা অমরচন্দ্র (১২৫০), দ্বাদশ শতাব্দীর রামপালচরিত রচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী—রাঘবপাণ্ডবীয় রচয়িতা ধনঞ্জয় (শ্রুতকীর্তি) এবং মাধব ভট্ট, রাঘবনৈষধেয়—রচয়িতা হরদত্ত স্‌রি, রাঘবপাণ্ডবীয় যাদবীয় রচয়িতা চিদাম্বর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব মহাকাব্যের বিশেষ পরিচয় দেওয়ার অবকাশ এখানে নেই। সুতরাং মহাকবি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলে এই পরিচ্ছেদ শেষ করছি।

৯। শ্রীহর্ষ-রচিত "নৈষধ চরিতম্‌"

ভারবির 'কিঁরাতজুর্নীয়'-এর মতোই নৈষধ-চরিতম্‌' বনপর্বের একটি অধ্যায় অবলম্বনে রচিত। অধ্যায়টির নাম—নলোপাখ্যান পর্বাধ্যায়। যুধিষ্ঠির যখন কাম্যকবনে ছিলেন তখন বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরের এক প্রশ্নের উত্তরে নলোপাখ্যান শুনিয়েছিলেন। এই উপাখ্যানপর্বাধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ১। ভীমের অধৈর্য—যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা—কাম্যকবনে মহর্ষি বৃহদশ্বের আগমন—যুধিষ্ঠিরের অনুশোচনা—বৃহদশ্ব-কর্তৃক নলোপাখ্যান-কথন। ২। নিষধরাজ নল—দেবজ্ঞ, দ্যূতপ্রিয়, সত্যবাদী এবং বৃহৎ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি—সমসাময়িক বিদর্ভ রাজ ভীম—তাঁর কন্যা অদ্বিতীয়া সুন্দরী দময়ন্তী।—দময়ন্তী-নলের পূর্বরাগ। দময়ন্তীর স্বয়ংবর। স্বয়ংবরে দেবতারাও উপস্থিত—নলের দময়ন্তীলাভ। ৩। কলির প্রকোপ এবং আক্রমণ—নল-পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া। ৪। দময়ন্তীর বিচ্ছেদ—দময়ন্তীর পর্যটন চেদিরাজ সুবাহুর নগরে উপস্থিতি এবং রাজমাতার কাছে আশ্রয়লাভ। ৫। কর্কোটক নাগ—নাগের দংশনে নলের রূপান্তর—বাহুক নাম নিয়ে

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের কাছে 'সারথি' রূপে অবস্থান। ৬। পিত্রালয়ে দময়ন্তী—দময়ন্তীর ঋতুপর্ণ রাজার কাছে স্বয়ংবর সংবাদ প্রেরণ—নল-ঋতুপর্ণের বিদর্ভে আগমন—নল দময়ন্তীর পুনর্মিলন—নলের রাজ্যোদ্ধার। এই কাহিনীকে শ্রীহর্ষ (১৩শ শতাব্দীর লোক) কল্পনা ও মনন শক্তিবলে মহাকাব্যের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।

বাংলা মহাকাব্য

প্রাচীন ভারতে আর্যগোষ্ঠীর জনসাধারণ কোন ভাষায় কথাবার্তার কার্য নির্বাহ করতেন—সংস্কৃত বলতেন অথবা প্রাকৃত বলতেন—তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানিনে। এইটুকুই শুধু অনুমান করতে পেরেছি যে পণ্ডিতরা সংস্কৃত এবং অশিক্ষিতরা প্রাকৃত ভাষায় কথা বলতেন। আমরা আজ যে ভাষায় কথা বলি সেই আধুনিক আর্যভাষা ঐ প্রাকৃত ভাষারই বংশধর—প্রাকৃতের সন্তান অপভ্রংশের বংশধর। এই আধুনিক ভাষাগুলির জন্মকাল আনুমানিক দশম শতাব্দী। বাংলা ভাষা পূর্বপ্রাকৃতের বংশে জন্মগ্রহণ করেছে দশম-একাদশ শতব্দীতে এবং তারপর বাঙালী সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হতে হতে বর্তমান রূপলাভ করেছে।

দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাঙালীর সমাজজীবনের প্রেরণায় যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছে, সমাজ-জীবনের প্রকৃতি অনুসারেই সেই সব সাহিত্য হয়েছে প্রধানতঃ ধর্মমূলক। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগ পদাবলী অথবা পাঁচালীর আকারে—মঙ্গলকাব্যের আকারে ব্যক্ত হয়েছে। যাকে বলা যায় অ-ধর্মমূলক রচনা তা রচিত হয়েছে অতি সামান্যই এবং তার নিদর্শন লোকসংগীত এবং লোকগাথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে—পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) বাংলার উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং ক্রমশঃ বাংলার অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন, নাগরিকজীবন এবং ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে—নব যুগ সৃষ্টি করে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেই প্রভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট নবযুগের প্রথম

মহাকবি। তিনি হোমার-ভার্জিল-দান্তে-ট্যাসো, শেক্সপীয়র, মিলটন প্রমুখ মহাকবির কাব্য-মহাদেশে ভ্রমণ করে সম্ভ্রান্ত। শুধু বাল্মীকি-ব্যাস—কৃত্তিবাস-কাশীদাস আর তার মহৎ ক্ষুধাকে তৃপ্ত করতে পারে না। মিলটনের মহাকাব্যের ছন্দে তিনি কান সেধেছেন। হোমার ভার্জিল-দান্তে-ট্যাসোর কল্পনার ইন্দ্রধনু দেখে মন তার আবেশে বিভোর। তাদের সৃষ্ট চরিত্রে ইয়োরোপীয় জীবনাবেগের যে তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে তার স্পর্শে মধুসূদনের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত। এই সুরসাধনা, এই আবেগ এবং এই জীবনাবেগ কামনা এক হয়ে মধুসূদনকে মহাকবি ক'রে তুলেছে। কোন বিষয়বস্তুর মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে মধুসূদন মহাকবি হননি, মহাকবি হয়েছেন মহাকবি হওয়ার সংকল্প ও আবেগের বলে—মহাকবি-শক্তির উন্মেষের ফলে। শক্তির তাড়নায় তিনি বিষয়বস্তু খুঁজে নিয়েছেন, বিষয়বস্তুর আকর্ষণে তিনি শক্তি প্রয়োগ করেননি। কোন ভাব বা ভাবনাকে ব্যক্ত করার অপার বেদনায় তিনি মেঘনাদবধ লেখেননি, 'কবিচিত্তফুলবনমধু' পান করে যে উন্মাদনা এসেছে সেই উন্মাদনাকেই তিনি মেঘনাদবধ কাহিনী অবলম্বন ক'রে ব্যক্ত করেছেন। যতটা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কবিকল্পনার সংজ্ঞান সংমিশ্রণের ফলে ততটা নির্বিকল্পক অখণ্ড ধ্যানের ফলে মেঘনাদবধ কাব্যের সৃষ্টি হয়নি এবং তা হয়নি বলেই মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা মহাকাব্যসুলভ অনেক কিছুর বর্ণনা পাই, অনেক রকম ঘটনার বা পরিস্থিতির পরিকল্পনা দেখি, চরিত্রগুলির তীব্র হৃদয়াবেগের বর্ণনা ও উপস্থাপনা দেখতে পাই, কিন্তু যা পাইনা তা' হচ্ছে কবির কোন মহৎ উদ্দেশ্য এবং প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে জৈবিক ও নৈতিক সত্তার দ্বন্দ্ব তথা চরিত্রের সঙ্গতিপূর্ণ ও সম্ভাব্য বিকাশ। রাবণ বা ইন্দ্রজিৎ কেউই সুপরিব্যক্ত হয়ে উঠতে পারেনি এবং পারেনি এই কারণেই যে মধুসূদন তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পূর্ণবৃত্ত আঁকতে পারেননি—তাঁদের চরিত্রে কোনরূপ আদর্শনিষ্ঠা বা উদ্দেশ্য স্থাপনা করেননি। দেশবৈরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাবণ যুদ্ধপরিকর বটে কিন্তু বীরবাহুর মাতা যে মূল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তার উত্তর রাবণ এড়িয়ে গেছেন নিজের কার্য সমর্থন করার মতো কোন আদর্শ আঁকড়ে ধরতে পারেননি। ইন্দ্রজিতের মধ্যেও আমরা পিতার প্রতি নির্বিচার আনুগত্য এবং দেশবৈরী নাশ করার অবোধ আবেগ ছাড়া আর কোন মহৎভাবাদর্শের চেতনা পাইনে। মেঘনাদবধ কাব্যকে যদি আমরা

স্বদেশপ্রেমের বা জাত্যভিমানের মহাকাব্য ব'লতে চাই তা'হলেও এই কথাটা স্বীকার করতে পারব না যে মধুসূদন রাবণকে বা ইন্দ্রজিতকে সচেতনভাবে স্বদেশপ্রেমিক করে—স্বদেশপ্রেম-স্থায়িভাব দিয়ে গঠন করেছেন। যে ইলিয়ডের অনুকরণে তিনি দ্বিতীয় ইলিয়ড রচনা করতে চেষ্টা করেছেন সেই ইলিয়ডেরই কবির মতো মধুসূদন 'মেঘনাদবধ-কাব্যকে 'প্যাথেটিক' করেছেন—রামায়ণ মহাভারতের মতো বা অডিসির মতো 'এথিকাল' করতে পারেননি। ইলিয়ডের মতোই তিনি মেঘনাদবধে কার্য-ঐক্য রক্ষা করেছেন—মেঘনাদের অভিষেক দিয়ে কাব্যের আরম্ভ করেছেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দিয়ে উপসংহার করেছেন। মেঘনাদের ট্র্যাজেডি বর্ণনা করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছে এবং তাতে হেকটরের ট্র্যাজেডি হয়েছে তাঁর আদর্শ। এই ট্র্যাজেডির কথা রামায়ণেরই অরণ্যকাণ্ডে মারীচের মুখে ব্যক্ত হয়েছে—

অকুর্ব্বন্তোঽপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরদোষৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগহ্রদে যথা ॥

—পাপ না ক'রেও শুচিব্যক্তি পাপসংসর্গে থেকে পরদোষে বিনষ্ট হয়ে থাকেন—যেমন বিনষ্ট হয় নাগহ্রদে থেকে মৎস্যগণ। হেকটর এবং মেঘনাদের একই ট্র্যাজেডি—পরদোষে তাঁরা অকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। হেকটর দিয়েছেন প্যারিসের দোষে, মেঘনাদ দিয়েছেন রাবণের দোষে এবং দুইজনেরই জীবন কীর্তিখ্যাতির অনন্ত সম্ভাবনায় পূর্ণ। দুয়েরই যুদ্ধ প্রেরণা—বিদেশী শত্রুর অবরোধ থেকে দেশকে মুক্ত করা। কিন্তু আসল কথা এই যে কবি মেঘনাদের চরিত্রকে আমাদের সামনে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্ত করেননি—দেশপ্রীতিই যে তাঁর চরিত্রের স্থায়িভাব তা বীজাকারে যুগসন্ধিতে স্থাপনা করেননি। অবরুদ্ধ লঙ্কার বাইরে (প্রমীলা অবরোধ ভেদ করে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন) প্রমীলার প্রমোদ উদ্যানে তিনি নিশ্চিন্তে কালযাপন করেন। যুদ্ধের শেষ পরিণতি না দেখেই যিনি প্রমোদ উদ্যানে চলে যান তাঁকে আমরা আর যাই বলি দেশপ্রেমিক বলতে পারিনে। ট্যাসোর "জেরুজালেম লিবারেটা" মহাকাব্যের অনুকরণ করতে যেয়ে মধুসূদন তাল সামলাতে পারেননি—সুসঙ্গতির সঙ্গে মেঘনাদকে—প্রমীলার প্রমোদ-উদ্যানে নিয়ে যেতে পারেননি। সে যাই হোক, মেঘনাদবধ বাংলার প্রথম এবং সার্থক মহাকাব্য।

রীতির ও রসের এমন সমন্বয় আর কোন বাংলা মহাকাব্যে দেখতে পাওয়া যায় না। কাব্যখানি রচিত হয়েছে—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ইলিয়ডের সমসংখ্যক সর্গ রচনা করেন নি এবং বানরসেনা দিয়ে যুদ্ধ চালাতে ঘৃণা বোধ ক'রেছেন ব'লেই করেননি—নয় সর্গে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেছেন! কাব্যখানির বৃত্ত গঠন-কৌশলেও মধুসূদন যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বীরবাহুর মৃত্যুর পরে ইন্দ্রজিতের অভিষেক দিয়ে কাব্যের প্রারম্ভ করেছেন বটে, কিন্তু চতুর্থ সর্গে তিনি সংক্ষেপে পূর্ববর্তী ঘটনার অবতারণা করার একটা সুযোগ করে নিয়ে সমগ্র রামায়ণ কাহিনীর পটভূমিকায় মেঘনাদবধ-ঘটনাটিকে স্থাপনা করতে তথা মেঘনাদবধ-কাব্যখণ্ডের মধ্যে অখণ্ড রামায়ণকে প্রতিভাত করতে চেষ্টা করেছেন। মেঘনাদবধ বাংলাসাহিত্যের প্রথম এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাকাব্য—অতুলনীয় মধুচক্র।

বাংলার দ্বিতীয় মহাকাব্য—হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'। কাব্যখানি প্রথম দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ড—(১-১১শ সর্গ) ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড (বাকী ত্রয়োদশ সর্গ) ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। মধুসূদনকে হেমচন্দ্র আর কোন বিষয়ে হারাতে না পারলেও—এই একটি বিষয়ে হারিয়ে দিয়েছেন। ইলিয়ড-অডিসির সম-সংখ্যক সর্গ রচনা করেছেন—মহাকাব্যের উপযুক্ত 'বিস্তার' দেখিয়ে সহজেই সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। "অবশ্যএকথা স্বীকার করিতে হইবে যে বৃত্রসংহারের আখ্যানবস্তুতে মহাকাব্যোচিত যে বিশালতা আছে তাহা মেঘনাদবধে নাই"—ড়ক্টর শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের এই মন্তব্য মিথ্যা নয়, তবে প্রশ্ন শুধু এই কারণেই কি সম-সাময়িক অনেক সমালোচক এমন কি কিশোর রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধের তুলনায় বৃত্রসংহারকে উচ্চতর স্থান দিয়েছেন? আমার মনে হয়—হেমচন্দ্র সমালোচকদের চিত্ত অন্য কোন কিছু দিয়ে, বিষয়বস্তুর বিশালতা নয়, বিষয়বস্তুর নৈতিক প্রকৃতি দিয়ে আকৃষ্ট করেছিলেন। "স্বর্গ উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের বিষয়"—এ কথা রবীন্দ্রনাথ ঐ নৈতিক প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বলেছিলেন। এ কথা হয়তো ঠিক যে "সাধারণ পাঠকের কাছে বৃত্রসংহারের ছন্দের লালিত্য, রচনার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সারল্য সবিশেষ সহজবোধ্য হইয়াছিল", কিন্তু এ কথা আরো ঠিক যে দেবাসুরের যুদ্ধ কাহিনী—অসুর অধিকৃত স্বর্গকে মুক্ত করবার সংগ্রাম—

অস্থিদান করে স্বর্গকে মুক্ত করার সাধনা, নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে বাঙালীর মনে সাড়া জাগিয়েছিল। বৃত্রসংহার-কাব্যে বাঙালী স্বর্গ-রূপ পরাধীন ভারত-ভূমির বর্তমান গ্লানিময় জীবনের ছবি মুক্তির উপায় এবং ভবিষ্যৎ মুক্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপটি রূপকাকারে দেখতে পেয়েছিল বলেই হেমচন্দ্রকে অত্যুল্লসিত হয়ে গ্রহণ করেছিল এবং বৃত্রসংহার-কাব্যকে মেঘনাদ বধের শীর্ষে স্থান দেওয়ার প্রবণতা দেখিয়েছিল। মেঘনাদবধে দেশবৈরী নাশের আহ্বান থাকলেও, সেই আহ্বান পরোক্ষভাবে অন্যায়কারী রাবণের মুখ থেকে বেরিয়েছে ব'লে তেমন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি এবং যে পরিমাণে তা পারেনি সেই পরিমাণেই তা জাতির অভিমানে সাড়া জাগাতে অসমর্থ হয়েছে। ইন্দ্রজিতের মধ্যে আমরা অদ্ভুতকর্মা বীরকে পেয়েছি, পিতৃভক্ত পুত্রকে দেখেছি, লঙ্কার গৌরবরবিকেও দেখেছি কিন্তু পাইনি কোন মুক্তি-যোদ্ধাকে, দেখিনি পররাজ্যলোলুপ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামলিপ্ত কোন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ দেশভক্তকে। কিন্তু হেমচন্দ্রের আহ্বান এসেছে স্বর্গ-বিতাড়িত দেবতাদের মুখ থেকে এবং সে আহ্বান পররাজ্যগ্রাসী অসুর শক্তির বিরুদ্ধে অস্থিদান করে সংগ্রাম করার আহ্বান—অসুরদের অত্যাচার অবিচার থেকে দেবভূমিকে (ভারতবর্ষকে) মুক্ত করার আহ্বান। এই আহ্বানে বাঙালীর প্রাণ সহজ উল্লাসেই সাড়া দিয়েছিল। বৃত্রসংহার-কাব্যে বাঙালী বৃত্রের বা রুদ্রপীড়ের ট্র্যাজেডি আস্বাদন করতে যায়নি, চায়ওনি ; আস্বাদন করেছে স্বর্গোদ্ধারের উল্লাসকে মুক্তভারতের স্বপ্নসুখকে। পরিকল্পনায় দু'খানি কাব্যের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও প্রকরণের পার্থক্যে মেঘনাদবধ হয়েছে অন্তরে বাইরে ট্র্যাজেডি, বৃত্রসংহার হ'য়েছে বাইরে ট্র্যাজেডি অন্তরে কমেডি। কারণ 'বৃত্রের সর্বনাশ' স্বর্গের মুক্তি এনেছে— যে মুক্তি আমরা মনে প্রাণে কামনা করি। রুদ্রপীড়ের পতন এবং বৃত্রসংহার প্রভৃতি ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে ট্র্যাজিক বলে মনে হ'লেও, সামাজিকের বাসনার প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় 'বৃত্রসংহার' মনে স্বর্গমুক্তিজাত আনন্দ জাগায়। অন্যপক্ষে সীতার মুক্তি জাতীয় মুক্তির মতো আবেগপূর্ণ ঘটনা না হওয়ায়, ইন্দ্রজিতের পতনে এবং রাবণের বিলাপে সামাজিকের প্রাণে বেদনাই জাগে। বৃত্রসংহারের প্রতিষ্ঠার মূলে রচনারীতির চেয়েও জাতীয় পরাধীনতা ও মুক্তির ব্যঞ্জনাই বেশী কাজ করেছে। মধুসূদনের ছন্দের

ধ্বনি গাম্ভীর্য হেমচন্দ্রের আয়ত্তের বাইরে, তাঁর চরিত্রের অভিব্যক্তি হেমচন্দ্রের সাধনার বস্তু, কিন্তু ঐ একটি বিষয়ে—জাতীয় পরাধীনতা প্রদর্শনে ও মুক্তির ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অর্থাৎ একটি মহান উদ্দেশ্যকে রূপকাকারে ব্যক্ত করার চেষ্টায়, হেমচন্দ্র মধুসূদনের চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

কবি হেমচন্দ্র যেমন মাতৃভূমির পরাধীনতার গ্লানির কথা ও মুক্তির উপায় চিন্তা করে বৃত্রসংহার-মহাকাব্য পরিকল্পনা করেছিলেন, কবি নবীনচন্দ্রও তেমনি নানাজাতির অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ ও দুর্বল, পরাধীন ভারতবর্ষে মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং মহাভারতের কাহিনীর কাঠামোতে মহান ও নব মহাভারতের আদর্শ-প্রতিমা গঠন করতে চেষ্টা করেছিলেন। পরাধীনতার চেতনা ও বেদনাকে—ইংরেজের পদানত হওয়ার ইতিহাসকে তিনি 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫) নামক পঞ্চ সর্গবন্ধ কাব্যে ব্যক্ত করেছেন। অষ্টাধিক সর্গ না থাকলে, কাব্যের মহাকাব্যোচিত 'বিস্তার' থাকে না সেই হিসাবে পলাশির যুদ্ধকে কেউ কেউ "ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য" বলেছেন। আমরা কাব্যখানিকে মহাকাব্যকল্প রচনা (epicling) বলতে চাই। অবশ্য 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের 'বিষয়বস্তু' যে মহাকাব্যের উপযুক্ত বিষয়বস্তু—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে নবীনচন্দ্রের রচনারীতিতে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য রয়েছে। "পলাশির যুদ্ধ" রচনার মূলে যে প্রেরণা কাজ করেছিল, সেই প্রেরণারই আর একটি রূপ দেখা গিয়েছিল—'রৈবতক' (১৮৮৬) 'কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) এবং প্রভাস (১৮৯৬) কাব্যত্রয়ী পরিকল্পনার মধ্যে। অখণ্ড ভারতবর্ষ গঠনের, প্রচেষ্টা তখন আরম্ভ হয়েছে। ব্রিটিশের মতো "এক ধর্ম এক জাতি এক সিংহাসনে" এর জন্য, আর্য এবং অনার্য জাতিগুলির সমবায়ে একটি মহাজাতি গঠনের জন্য শিক্ষিত এবং জাগ্রতদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আবেগ দেখা দিয়েছে। শক হূণ দল মোগল পাঠানকে একজাতি দেহে লীন করবার তথা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চিন্তাও চেষ্টা এসেছে। এক কথায় ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করার সংকল্প জেগেছে। কবি নবীনচন্দ্রের মনেও সেই অখণ্ড ভারতের ধ্যান অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁরও ধারণা খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্মপাশে না বাঁধতে পারলে—একজাতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। তার জন্য চাই আর্য-অনার্যের মিলন এবং একধর্মে সকলের দীক্ষা। এই রোমান্টিক জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় কবি নবীনচন্দ্র মহাভারত

কাহিনীকে নতুন ভাবাদর্শের আলোকে স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দেখাতে চাইলেন মহাভারত বাহ্যতঃ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের কাহিনী বটে, কিন্তু আসলে আর্য-অনার্যের মিলিত শক্তির সমবায়ে শ্রীকৃষ্ণের 'প্রেমময় প্রীতিময় পবিত্রতাময়' মহাভারত স্থাপিত করার সাধনার ইতিহাস। ব্যাসের জ্ঞানবলে এবং পার্থের বাহুবলে শ্রীকৃষ্ণ এই মহাভারত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তা করতে আর্য-অনার্য অনেকেরই বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

কৃষ্ণের ধারণা—

'এক ধর্ম্ম এক জাতি একমাত্র রাজনীতি
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত
জননীর খণ্ড-দেহ হবে না মিলিত।'

'জননীর খণ্ডদেহ'কে মিলিত করার ঐকান্তিক আগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের এবং মহাকবিরও। মহাকবির মতে মহাভারতের যুদ্ধ আসলে কৃষ্ণভক্ত এবং কৃষ্ণদ্বেষীদের যুদ্ধ—কৃষ্ণের আদর্শে বিশ্বাসী পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বেষী দুর্বাসা শিষ্য অনার্য বাসুকী এবং আর্য কৌরবদের যুদ্ধ—ব্যাসের মস্তিষ্কের এবং অর্জ্জুনের বাহুর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই ধারণার ছাঁচে সমস্ত ঘটনাকে কবি ঢালাই করতে চেষ্টা করেছেন। ফলে কোন কোন ঘটনার মুখ্য কারণ গৌণ কারণে পরিণত হয়েছে—কবি কার্যের নতুন কারণ আবিষ্কার করেছেন। নিশ্চয়ই কুরু পাণ্ডব যুদ্ধের মুখ্য কারণ—সুভদ্রাহরণ বা অর্জ্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ নয়, কিন্তু কবি মূল সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক ব্যাপার ক'রে নতুন তাৎপর্য দান করেছেন এবং তাকেই কুরু-পাণ্ডবের গৃহ বিবাদের কারণ রূপে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই স্বাধীনতা কবির আছে সুতরাং এ জন্য কবিকে অভিযুক্ত করে কোন লাভ নেই।

এবার কাব্যত্রয়ীর—সর্গ বিন্যাসের পরিচয় দেওয়া যাক এবং দেখা যাক কবি তাঁর পরিকল্পনাকে কিভাবে কার্যে পরিণত করেছেন।

***রৈবতক কাব্যে ২০ সর্গ।**

১ম সর্গে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ—'যাদব কৌরবকুল হইবে বিনাশ'।

২য় সর্গে—কৃষ্ণ-অর্জুনের ব্যাসের আশ্রম অভিমুখে গমন। পথে অর্জুন ও সুভদ্রার দর্শন ও অনুরাগ সঞ্চার।

৩য় সর্গে—ব্যাস-শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সংবাদ। শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত পরিকল্পনা।

৪র্থ সর্গে—দুর্বাসা বাসুকির ষড়যন্ত্র (অনার্য শক্তি)

৫ম সর্গে—সখী সুলোচনার সঙ্গে সত্যভামার রহস্যালাপ।

৬ষ্ঠ সর্গে—সুলোচনা-সত্যভামার কৌশলে সুভদ্রা অর্জুনের মিলন।

৭ম সর্গে—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মৃতি।

৮ম সর্গে—বাসুকি-ভগিনী জরৎকারুর পূর্বস্মৃতি—জরৎকারুকে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তার ধারণা শ্রীকৃষ্ণ আর্যরক্ত কলুষিত হওয়ার ভয়েই তা করেছিলেন।

৯ম সর্গে—অর্জুনের ছদ্মবেশী ভৃত্য শৈলের নীরব প্রেমের পরিচয় এবং গোপনে পিতৃব্যপুত্র বাসুকির সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

১০ম সর্গে—অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাকে দস্যু হস্ত থেকে উদ্ধার এবং আততায়ীর হাত থেকে শৈল কর্তৃক অর্জুনের পরিত্রাণ।

১১শ সর্গে—শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা সংবাদ—অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ স্থিরীকরণ।

১২শ সর্গে—ব্যাস-কৃষ্ণ সংবাদ। কৃষ্ণকর্তৃক নিষ্কাম ধর্মের এবং অখণ্ড মহাভারতের আদর্শ নির্দেশ।

১৩শ সর্গে—দুর্বাসা-বলদেব সংবাদ। দুর্বাসার উত্তেজনাকর চক্রান্তবাক্যে বলদেব উত্তেজিত হয়ে দুর্যোধনের হস্তে সুভদ্রাকে সমর্পণ করার সংকল্প করেন।

১৪শ সর্গে—জরৎকাররূপী দুর্বাসা ও বাসুকির কথোপকথন।

১৫শ সর্গে—সত্যভামা, রুক্মিণী, সুলোচনা ও সত্যভামার বিশ্রম্ভালাপ।

১৬শ সর্গে—সত্যভামা-সুলোচনা কর্তৃক অর্জুনের হস্তে সুভদ্রা সমর্পণ।

১৭শ সর্গে—কৃষ্ণার্জুন সংবাদ।

১৮শ সর্গে—দুর্বাসা-জরৎকারুর দাম্পত্য অশান্তি—জরৎকারুর প্রতিজ্ঞা—'অনার্যরাজ্য করিব উদ্ধার'।

১৯শ সর্গে—অর্জুনের কাছে শৈলের আত্মপ্রকাশ। নিষ্কাম প্রেমের সাধনায় শৈলের সিদ্ধিলাভ।

২০শ সর্গে—সুভদ্রা হরণ।

দেখা যাচ্ছে—রৈবতক কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় আদর্শপ্রাণ সুভদ্রার সঙ্গে কৃষ্ণ-আদর্শে-দীক্ষিত অর্জুনের বিবাহ—মহাভারতের আদর্শ ঘোষণা এবং ভাবী আর্য-অনার্য দ্বন্দ্বের এবং কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের বীজস্থাপনা। এই কার্যটুকু সম্পন্ন করতে কবি ২০টি সর্গ ব্যয় করেছেন এবং তা'তে কবির অমিতব্যয়িতাই প্রকাশ পেয়েছে। রোমান্স-প্রীতি কবি মনের ভারসাম্য নষ্ট করেছে ব'লেই এমনটি ঘটেছে।

*দ্বিতীয় খণ্ড কুরুক্ষেত্র।** উক্ত বীজেরই পরিবর্ধিত রূপ এতে ব্যক্ত হ'য়েছে।

১ম সর্গে—ব্যাস ও তাঁর ছদ্মবেশী শিষ্য শৈলের কথোপকথন। সুভদ্রার নিকট ব্যাসের ভগবদ্ গীতা প্রেরণ।

২য় সর্গে—উত্তরা, অভিমন্যু, অভিমন্যুর ধাত্রীমাতা সুলোচনার কৌতুক আলাপ।

৩য় সর্গে—সুলোচনা ও সুভদ্রার প্রেমধর্ম নিয়ে আলোচনা।

৪র্থ সর্গে—সুভদ্রা-অভিমন্যু সংবাদ।

৫ম সর্গে—জরৎকারু ও বাসুকির মিলন, দুর্বাসার মন্ত্রণা।

৬ষ্ঠ সর্গে—অভিমন্যু উত্তরাকে নিয়ে সুলোচনা বিরাটরাজ ও অর্জুনের গার্হস্থ্য চিত্র।

৭ম সর্গে—দুর্বাসার আদেশে জরৎকারুর কর্ণ শিবিরে যাওয়া—পথে কৃষ্ণের দর্শন প্রত্যাশায় পাণ্ডব শিবিরের অভিমুখে গমন এবং মূর্চ্ছা।

৮ম সর্গে—মূর্চ্ছা ভঙ্গের পরে জরৎকারু দেখে—সুভদ্রা তাকে কোলে করে বসে আছে এবং কৃষ্ণ পাশে বসে চোখে ও কপালে জল দিচ্ছেন। সুভদ্রা তাকে সান্ত্বনা দেয়—আর্য অনার্যে ভেদ নেই।

৯ম সর্গে—ভীষ্ম-কৃষ্ণ সংবাদ। ভীষ্মের কৃষ্ণভক্তির উচ্ছ্বাস।

১০ম সর্গে—কর্ণ-দুর্বাসা সংবাদ। দুর্বাসা কর্ণকে জন্মরহস্য জানালে কর্ণ পাণ্ডববধে কৃতসংকল্প হলেন।

১১শ সর্গে—অভিমন্যু-উত্তরার কথোপকথন।

১২শ সর্গে—ব্যাস-কৃষ্ণ সংবাদ।

১৩শ সর্গে—শৈল ও সুভদ্রার অন্তরঙ্গ আলাপ।

১৪শ সর্গে—যুদ্ধযাত্রার প্রারম্ভে অভিমন্যুর বিদায়গ্রহণ।

১৫শ সর্গে—অর্জুন-কর্তৃক অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ—তাঁর বুদ্ধির জড়তামুক্তি।

১৬শ সর্গে—সুলোচনার মৃত্যু, সুভদ্রার অসীম ধৈর্য এবং মৃত অভিমন্যু সুলোচনার পাশে শৈল-সুভদ্রা অর্জুন-কৃষ্ণের ভাবসম্মিলন।

১৭শ সর্গে—উত্তরার গম্ভীর শোক এবং অভিমন্যুর মৃতদেহের সৎকার। কবি কুরুক্ষেত্রের রণদামামাকে প্রেম-বাৎসল্যের মধুর আলাপে পরিণত করেছেন এবং করেছেন বোধ হয় এই কারণেই যে কুরুক্ষেত্র তার কাছে মহাভারত প্রতিষ্ঠার উপায় মাত্র—উপলক্ষ্য মাত্র—সুভদ্রা-অর্জুনের নিষ্কাম ধর্মসাধনার পরীক্ষাস্থল। অভিমন্যুর মৃত্যুতে সুভদ্রা অর্জুনের অগ্নি-পরীক্ষা হয়েছে—নিষ্কাম ধর্ম-সাধনার ব্রতে উভয়ে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এই কারণেই কবি অভিমন্যুর সৎকারের সঙ্গে সঙ্গে 'কুরুক্ষেত্র'-পর্ব শেষ করেছেন।

প্রভাস কাব্যত্রয়ীর শেষ খণ্ড। পরিবর্ধিত বীজের চূড়ান্ত পরিণতি। কৃষ্ণলীলার উপসংহার।

১ম সর্গে—সত্যভামা-রুক্মিণীর কথোপকথনে কৃষ্ণলীলা সংবরণের আভাস।

২য় সর্গে—দুর্বাসার চরেরা তাঁকে কৃষ্ণপ্রতিষ্ঠিত শান্তি ও নিষ্কাম ধর্মের আশা জানাচ্ছে। দুর্বাসার সান্ত্বনা—তাঁর অভিশাপ ফলবেই।

৩য় সর্গে—শৈল-জরৎকারুসংবাদ।

৪র্থ সর্গে—বাসুকিকে দুর্বাসা বঞ্চনা করেছেন।

৫ম সর্গে—প্রভাসে কৃষ্ণলীলোৎসবে আর্য-অনার্যের মিলন।

৬ষ্ঠ সর্গে—কৃষ্ণান্বেষণে ভ্রাম্যমাণ জরৎকারুকে দেখে যাদবগণের লালসার উদ্রেক ও আত্মকলহোৎপত্তি।

৭ম সর্গে—যদুকুল ধ্বংস।

৮ম সর্গে—বলদেবের মহাপ্রস্থান—কৃষ্ণের সঙ্গে বাসুকির মিলন।

৯ম সর্গে—জরৎকারু-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণে কৃষ্ণের লীলাসংবরণের আগে উভয়ের মিলন।

১০ম সর্গে—দুর্বাসার মুক্তি।

১১শ সর্গে—বাসুকির প্রেমতন্ময়তা ও স্বর্গারোহণ।

১২শ সর্গে—ব্যাস-অর্জুন সংবাদ।

১৩শ সর্গে—অর্জুনের কাছে শৈল শ্রীক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা করছে।

প্রভাস খণ্ডে আর্য-অনার্যের মিলন সম্পূর্ণ হয়েছে। বাসুকির প্রতিরোধ, দুর্বাসার চক্রান্ত জরৎকারুর প্রতিহিংসাপরায়ণতা—সব কৃষ্ণপ্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে—অনার্যরা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। ফলে ভারত শ্রীক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে—সেখানে—

> "অনার্য ব্রাহ্মণ-আর্য গাবে এক কৃষ্ণনাম—
> আর্য ও অনার্য এক প্রেমে ভাসমান—
> প্রতিধ্বনি তুলি সিন্ধু গাবে হরিনাম।"

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস ত্রি-সন্ধিযুক্ত নাটকের মতো এক অখণ্ড রচনা। রৈবতক মুখ প্রতিমুখ (এক্সপোজিশান), কুরুক্ষেত্র—গর্ভসন্ধি (ক্ল্যাশ্) এবং প্রভাসে উপসংহার—(ক্লাইম্যাক্স)। রৈবতকে কবি বীজ স্থাপনা করেছেন, কুরুক্ষেত্রে বীজ পরিবর্ধিত বৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং প্রভাসে ফলাগম ঘটেছে। সুতরাং এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে কবি যে ভাবাদর্শকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন তা করতে সমর্থন হয়েছেন এবং ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও কাব্যত্রয়ীকে মহাকাব্যের মর্যাদাই দিতে হবে।

এই কাব্যত্রয়ীর সমালোচনা করার সময়ে অবশ্যই একথা আমাদের মনে রাখতে হবে—যে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে আধুনিক স্বপ্নবিলাসী জননায়ক রূপে দেখেন তা তিনি দেখতে পারেন এবং মহাভারত থেকে তিনি প্রচুর প্রমাণ দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে পারেন। আর একথাও প্রমাণ করতে খুব বেগ পেতে হয় না যে কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবদের অনেক কৃষ্ণদ্বেষীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং অনেক ক্ষত্রিয়ই কৃষ্ণকে অর্ঘ দিতে আপত্তি জানিয়েছিল—অর্থাৎ মহাভারতের মধ্যে কৃষ্ণভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণদ্বেষীর দ্বন্দ্ব আবিষ্কার নিছক কবিকল্পনা নয়। তারপর আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বও যেমন নিছক কবি কল্পনা নয়, তেমনি আর্যদের প্রাধান্যও অনৈতিহাসিক কোন ঘটনা নয়। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ এবং পূজা পাণ্ডবদের বিজয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—আর্য-অনার্যের শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষ দূরীভূত হয়েছিল—এ অনুমানও খুব স্বাভাবিক। অতএব মহাভারতের ঘটনাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বলে কবিকে আমরা নিন্দা করতে

পারিনে। কবির আর্য-অনার্য সমবায়ে এবং সর্বজাতির অধিকারের ভিত্তিতে মহাজাতি গঠনের আবেগ সর্বথা প্রশংসনীয়। এক ধর্ম এক জাতি এক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা যে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য তার মহাকাব্যিক গৌরব অস্বীকার করা চলে না। অবশ্য তা চলে তখনই যখন কবি ভাবকে রূপের মধ্যে অঙ্গ দিতে পারেন না—এবং ভাব ও ভাষার সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। এখন, এ কথা যদি আমরা সত্য বলে স্বীকার না করি যে সব কবিই একই ছন্দে মহাকাব্য লিখবেন—অমিত্রাক্ষর ছন্দে না লিখলে কাব্যকে মহাকাব্য বলা হবে না, আমরা যদি দেখে থাকি—হোমার ভার্জিল দান্তে ট্যাসো মিলটন পৃথক পৃথক ছন্দে কাব্য রচনা করেছেন, যদি এই কথাই সত্য হয় যে ভাষা ভাবকে অবলীলাক্রমে বহন করতে পেরেছে কি না অথবা ভাষার চাল-চলনে ভাবের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে কি না এটাই আসল বিচার্য—তা'হলে নবীনচন্দ্রের রচনায় মাইকেলের ছন্দোগাম্ভীর্য না পেয়ে হতাশ ও বিমুখ হ'লে চলবে না। দান্তের রীতি (স্টাইল) সম্বন্ধে সমালোচকরা যে কথা বলেছেন সেই কথাই আমরা বলব—মিলটনের বা মাইকেলের ছন্দের গুরু-গম্ভীরতা নবীনচন্দ্রে না থাকলেও, কবির রীতি একঘেয়ে বা লঘু-চপল হয়নি—ছন্দ ও ধ্বনি বিন্যাসে কবি ভাবের স্বভাবিক লয় ও গুরুত্ব উপযুক্ত মাত্রায় রক্ষা করতে পেরেছেন।

নবীনচন্দ্রের পরে—"যে দুই চারিজন মহাকাব্য রচনার দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হইতেছেন—হরগোবিন্দ (লস্কর) চৌধুরী, শশধর রায় এবং যোগীন্দ্রনাথ বসু।" (বাঃ সাঃ ইঃ—সুঃ সেঃ) হরগোবিন্দ চৌধুরীর দশানন বধ ১৩১০ সালে অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে, শশধর রায়ের ত্রিদিববিজয় ১৩০৩ সালে এবং রাঘববিজয় ১৩১০ সালে রচিত। এদের ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর কোন মূল্য তেমন নেই। যে দুখানি, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক দুই মূল্যই দাবী করতে পারে, সেই দুখানি উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য—যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পৃথ্বীরাজ(১৩২২) এবং শিবাজী (১৩২৫)। এই দু'খানি মহাকাব্য লেখার প্রেরণা তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই পাওয়া যায়। ন্যাশনাল রোমান্টিসিজমের উত্তপ্ত আবহাওয়া এই কাব্যের সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত। জাতীয় বীর পৃথ্বীরাজ বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করেছিলেন, শিবাজীও সংগ্রাম করেছিলেন জাতীয় গৌরব

রক্ষা করবার জন্য। এই সব বিশিষ্ট বীরদের বীরত্বগাথাকে কবি নাট্যকার সকলেই তখন দেশপ্রেমের আবেগে রূপদান করতে চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলা মহাকাব্যের ধারা এখানেই শেষ। বলা বাহুল্য যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা অতি সংক্ষিপ্ত এবং সামান্য পরিচয়। বিশেষ পরিচয় দিতে হলে পৃথক গ্রন্থের অবকাশ আবশ্যক।

গ্রন্থসূচী

১। Poetics—Aristotle

২। কাব্যদর্শন—দণ্ডী

৩। সাহিত্য দর্পণ—বিশ্বনাথ

৪। The Literary Criticism in the Renaissance —Spingarm

৫। The Growth of Literature—H.M. & N.K. Chadwick (3 Vols.—1932, 34, 36)

৬। A History of Epic poetry—J. Clark. (1900)

৭। The Rise of Greek Epic—G. Murray (1924)

। The Epic—L. Abercrombie (1914)

৯। Epic and Romance—W. P. Ker (1908)

১০। English Epic and Heroic Poetry —W. M. Dixon (1912)

১১। The English Epic Tradition —E. M. W. Tillyard (1926)

১২। The Heroic Age—N. K. Siddhanta

১৩। On the Sublime—Longinus

১৪। An Enquiry into the Origin of our Idea of the Beautiful and the Sublime—Barke

১৫। Critique of Judgement—Kant

১৬। Aesthetik—Hegel

১৭। Oxford Lectures on Poetry—A. C. Bradley

১৮। A Critical History of Modern Aesthetic—Listowell

১৯। Aesthetik—T. Lipps

২০। Aesthetic—J. Volket

পরিশিষ্ট

মহাকাব্যের তালিকা

(ক) সংস্কৃত মহাকাব্য—(প্রধান)

১। রামায়ণ—বাল্মীকি
২। মহাভারত—ব্যাস
৩। সৌন্দরানন্দ } —অশ্বঘোষ
৪। বুদ্ধচরিত } —অশ্বঘোষ
৫। রঘুবংশ—কালিদাস
৬। কিরাতার্জুনীয়—ভারবি
৭। রাবণ বধ (ভট্টিকাব্য)—ভট্টি
৮। জানকীহরণ—কুমার দাস
৯। শিশুপালবধ—মাঘ
১০। নৈষধচরিত—শ্রীহর্ষ

(খ) বাংলা মহাকাব্য

১। মেঘনাদবধ – মধুসূদন
২। বৃত্রসংহার—হেমচন্দ্র
৩। রৈবতক } —নবীনচন্দ্র
৪। কুরুক্ষেত্র } —নবীনচন্দ্র
৫। প্রভাস } —নবীনচন্দ্র
৬। শিবাজী } —যোগীন্দ্রনাথ বসু
৭। পৃথ্বীরাজ } —যোগীন্দ্রনাথ বসু

(গ) গ্রীক মহাকাব্য

১। ইলিয়াড } —হোমার
২। অডিসি } —হোমার
৩। আর্গনাটিকা—এপোলোনিয়াস রোডিয়াস

(ঘ) লাতিন মহাকাব্য

১। এনিড—ভার্জিল
২। ফার্সালিয়া—লুকান
৩। ইলিয়াস লাতিনা

(ঙ) আইসল্যাণ্ডের মহাকাব্য

১। এলডার এড্‌ডা (Elder Edda) [দ্বাদশ শতাব্দীর সংগ্রহ]

(চ) এ্যাংলো স্যাকশন মহাকাব্য

১। বিউল্‌ফ্ (Beowulf)—(৭ম ও ৮ম শতাব্দী)

(ছ) পারসিক মহাকাব্য

১। শাহনামা—ফেরদৌসী (১০০০ খৃঃ)

(জ) স্পেনদেশীয় মহাকাব্য

১। ক্যাণ্টার ডি মিও কিড্ (Cantar de mio Cid)
২। এল্ ক্যাণ্টার ডি মিও কিড (El cantar de mio Cid)

(ঝ) জার্মান মহাকাব্য

১। নিবেলুঙ্গেন্‌লাইড (Nibelur genlied—13th Ed.)

(ঞ) ইতালীয় মহাকাব্য

১। ওর্লাণ্ডো ইন্‌নে মোরাতো—বৈয়ার্দো
(Orlando Innamorato—Boiardo)
২। ওর্লাণ্ডো ফিউরিয়োসো—এরিয়োস্টো
(Orlando Furioso—Ariosto)
৩। রিনাল্‌ডো
৪। জেরুজালেম লিবারেটা—ট্যাসো

(ট) পর্তুগীজ মহাকাব্য

১। ওস্ লুসিয়াডাস্—লুই ডি কামুয়েস্
[Os Lusiadas—(1570)—Luis de Camoes]

(ঠ) ইংলণ্ডের মহাকাব্য

১। ফেয়েরি কুইন (১৫৮৯-৯৬) স্পেন্‌সার
২। প্যারাডাইজ লষ্ট (১৬৬৭)—মিলটন

(ভ) আমেরিকার মহাকাব্য

১। ভিশান অফ কলম্বাস—(১৭৮৭)

২। দি কলম্বিয়াড্—১৮০৭

৩। মবি ডিক (গদ্য)—১৮৫১

অনেকের মতে এগুলিও মহাকাব্য জাতীয়

সোরাব এ্যাণ্ড রুস্তম (১৮৫৩) ম্যাথ্ আর্নল্ড

কোঙ্গাল—(Congal)—ফার্গুসন (১৮৭২)

হারম্যান এ্যাণ্ড ডরোথিয়া—গেটে

সিগার্ড দি ভলসুঙ্—উইলিয়াম মরিস

দি ডন ইন ব্রিটেন—মিঃ ডটি (Doughty)

গেবির (Gebir)—ল্যাণ্ডর

ইডিলস্ অফ দি কিং—টেনিসন

ফাউষ্ট—গেটে

জন ব্রাউনস্ বডি (নাটক)—১৯২৮ স্টিফেন ভিনসো বেনেট

ডাইনাস্টস্ (নাটক)—হার্ডি